Registration No.: SO197407 of 2012-2013

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

চতুর্দশ বর্ষ❖সংখ্যা ১❖মার্চ ২০২৪

বিশেষ রচনা ঃ জিওর্দানো ব্রুনো – বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী

সম্পাদকীয় ঃ দেবতার জন্ম

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ 'বৃক্ষরোপণ জলবায়ু সমস্যার সর্বরোগহর দাওয়াই!'

বিশেষ রচনা ঃ খাদ্য ও পুষ্টি

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিশেষ রচনা ঃ ৫
◆জিওর্দানো ব্রুনো – বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী

◈ পাঠকের কলাম ঃ ১০
◆যুক্তিবাদী মানুষকে মারলে যুক্তি মরে না তার হাত...

◈ শ্রুতিনাটক ঃ ১১
◆বহ্নিশিখা

◈ সমীক্ষা ঃ ১৫
◆সুন্দরবনের গ্রামে কৃষকদের মধ্যে অনুসন্ধান

◈ সংগঠন সংবাদ ঃ ১৬

◈ চিঠিপত্র ঃ ১৬

◈ বিজ্ঞানের খবর ১৭

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ২০
◆'বৃক্ষরোপণ জলবায়ু সমস্যার সর্বরোগহর দাওয়াই!'

◈ স্মরণীয় বিজ্ঞানী ঃ ২৬
◆'বরেণ্য গণিতবিদ – রাজচন্দ্র বসু

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ২৭
◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ জনস্বাস্থ্য ঃ ৩১
◆রোগ তাড়াও, রোগ সারাও

◈ অতিথি কলাম ঃ ৩৪
◆চোখ – আমাদের মনের জানালা

◈ বিশেষ রচনা ঃ ৩৭
◆খাদ্য ও পুষ্টি

◈ ছড়া ঃ ৩৯
◆ছড়ায় নামতা

◈ স্মরণীয় ও বরণীয় ঃ ৩৯
◆শহীদ শ্রেষ্ঠ ভগৎ সিং-এর বিজ্ঞান ভাবনা

সম্পাদকীয় ঃ

দেবতার জন্ম

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্ম শেখায় জীবজগতের স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর অন্যান্য জীবজগৎ এক সঙ্গে সৃষ্টি করার পর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান শেখায় অজৈব থেকে জীবজগতের আগমন হয়েছে এক ধারাবাহিক ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যাকে এক কথায় বলে বিবর্তন। বিবর্তনের এই পথে এগিয়ে চলা মানুষ যখন শিকারী জীবন অতিক্রম করেনি, তখনই অজানা ভয়-ভীতি থেকে অলৌকিক বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল। প্রকৃতি সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানই ভয়-ভীতির কারণ ছিল। অলৌকিক বিশ্বাস থেকে জন্ম হল টোটেম ও টাবু। এভাবেই ক্রমশ মানুষ দেবতার জন্ম দিয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পিছিয়ে থাকা জনজাতিগুলি এরই অবশেষের ধারনা করেন। একেই সনাতন ধর্ম বলা হয়। বাকি অংশের ধর্মবিশ্বাসীরা তাদের আদিম বিশ্বাসকে সমাজ অনুযায়ী বিবর্তিত করে নিয়েছে। ফলে সনাতন ধর্ম কোথাও শাশ্বত-চিরস্থায়ী থাকে নি।

'মানুষের তৈরি ঈশ্বর? নাকি ঈশ্বরের তৈরি মানুষ? – এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানব সমাজ দুটি শিবিরে বিভক্ত। কারণ মানুষের মন বহুমাত্রিক। সে কেবলমাত্র ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে প্রকৃতি পূজা করে না, প্রকৃতির প্রতিটি পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করে, তার পরিবর্তনের নিয়মটা বুঝতে চায়। সেভাবেই আরেকদল মানুষ প্রকৃতি ও তারই অংশ জীবজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়াকে মান্যতা দিয়েছেন। এই দুই শিবিরের মাঝে রয়েছেন অসংখ্য দোদুল্যমান মানুষ। প্রতিটি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এই দোলাচলে থাকা মানুষকে আঘাত করে নয়, শিক্ষার আলোয় সচেতন করেই বৈজ্ঞানিক চেতনা সম্পন্ন করে গড়ে তোলেন।

আধুনিক পৃথিবী এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে জীবনের বেশিরভাগটাই সর্বসাধারণের জন্য। শুধুমাত্র অধিকাংশ সম্পদের মালিকানা রয়েছে মুষ্টিমেয়র হাতে। সেই কারণে আধুনিক মানব সমাজকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা যায় না। ভাগ করা যায় কেবলমাত্র সম্পদের উপর মালিকানার ভিত্তিতে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বর্তমানে এমন বিকাশ লাভ করেছে যে বিজ্ঞানীরা যে কাজগুলি করে চলেছেন তাতে অতি ক্ষুদ্র থেকে অতিবৃহৎ জগৎকে তাঁরা বস্তুজগৎ হিসেবেই দেখেন বস্তুর প্রতিটি গতিময়তাকেই তাঁরা সূত্রবদ্ধ করতে আগ্রহী। এই চলমান গবেষণাকালে কোথাও ঈশ্বর বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র জায়গা

নেই। এই বিজ্ঞান চেতনা জন-শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে জনমানসে প্রবেশ করেছে। কারণ এই দুই পক্ষের মাঝে কোনো অদৃশ্য প্রাচীর নেই। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে ঈশ্বরের জন্ম হওয়ার অর্থ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল ও বৈষয়িক জীবনের উন্নতি যাত্রার বিপরীতে হাঁটা। এটা কখনোই সম্ভব নয়। তাই বর্তমানে যদি কোথাও দেবতার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হয়ে থাকে তবে তা মানব সমাজের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় হয়নি। এর পিছনে রয়েছে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

হ্যাঁ, আমরা ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা জেলায় নব নির্মিত রামমন্দির প্রসঙ্গেই একথা বলছি। যখন 'দেবতার জন্মস্থান', তার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' – এসব বিষয়ে বিদ্যমান রাষ্ট্রের অতি সক্রিয়তা দেখি, রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, পুলিশ, সংবাদমাধ্যম জোরে সোরে এর প্রচারে নেমে পরে। তখন দেবতার জন্মটা হয় শক্তিশালীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নামান্তর। ভারতীয় উপমহাদেশে 'হিন্দু ধর্ম' বলতে কিছু ছিল না শুরুতে। আফগান ও ইউরেশিয়ানরা সিন্ধুনদ ও তার উপত্যকাকে হিন্দু প্রদেশ এবং অধিবাসীদের হিন্দু নামে অভিহিত করেছিল। এর থেকেই হিন্দু ও হিন্দুস্তান নামের উৎপত্তি। এই অঞ্চলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মতো মানুষ শুরুতে (অর্থাৎ শিকারি মানুষ) ছিল প্রকৃতির উপাসক। একেই সনাতন ধর্ম নাম দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন আর্য জনগোষ্ঠীর দ্বারা প্রচারিত বৈদিক ধর্মও সনাতন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাবের ফলে (বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি) সনাতন ধর্ম বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। এরপর মুসলিম শাসনকালে ইসলাম ধর্ম এবং ব্রিটিশ শাসনকালে খ্রিস্টধর্ম প্রসারিত হয়। খ্রিস্ট ধর্মের আদলে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করেন রাজা রামমোহন রায়। এই হিন্দু ধর্মকে পুনরুদ্ধারের জন্য যারা ভূমিকা রাখে তাদের মধ্যে দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দ আর্য জনগোষ্ঠীর বেদ ও উপনিষদের মধ্যে উপনিষদকে শেষ বেদ বা বেদান্ত নাম দেন। একেই তিনি হিন্দু ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বলে প্রচার শুরু করেন। সে সময় ম্যাক্সমুলারের অভিমত অনুসারে ইউরেশিয়া থেকে সিন্ধু উপত্যকায় আর্যরা এসেছে বলে জানা গেছিল। অর্থাৎ তারা বহিরাগত – এই ধারণা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কোনো স্থির নির্দিষ্ট মতামত দেন নি। তিনি দ্রাবিড়-দেরকে আর্যদের আগেকার এবং এখানকার অধিবাসীও বলেছেন। এই আর্যদের দার্শনিক গ্রন্থ উপনিষদকে তিনি হিন্দু ধর্মের ভিত্তিরূপে হাজির করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)-এর থিসিস অনুসারে আর্য জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ভারত। এখান থেকেই তারা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। তার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছিল বেদান্ত ধর্ম। তাদের মতে বিশ্বের সমস্ত মানুষ একসময় বেদান্ত অর্থাৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। পরবর্তীতে ধর্মান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মে। হিন্দুত্ববাদীদের এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্ম হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার কিছুকাল আগে থেকেই। সেই কারণে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ নিয়ে ওই হিন্দুদের ভূমিকা সময়ান্তরে পাল্টেছে। ভারতে যখন মোগল শাসন চলছে, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক যুগে বাবরের সেনাপতি মির বাকি ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করান। পরবর্তী তিনশো বছরে এই স্থানে হিন্দু মন্দির নির্মাণের জন্য কোনো দাবি শোনা যায় নি। ব্রিটিশ সরকারের নথিভুক্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯শে জুন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ফৈজাবাদ সাব-জজের আদালতে একটি মামলা হয়েছিল। মামলাটি করেছিলেন মোহান্ত রঘুবীর দাস। তিনি কিন্তু বিদ্যমান মসজিদের অভ্যন্তরে রামপূজার দাবিই করেন নি। মসজিদের বাইরে একটি ২১ ফুট লম্বা ও ১৭ ফুট চওড়া মঞ্চ বা চবুতরাতে একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণের অনুমতি চেয়েছিলেন। এর কারণও ছিল না আজকের হিন্দুত্ববাদীদের মতো। তিনি কেবলমাত্র আশ্রয় স্থল হিসেবে এই মাত্র ৩৫৭ বর্গফুট জায়গায় থাকার অধিকার চেয়েছিলেন। এই প্রথম বোধ হয় কোনো 'সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী' থাকার জায়গা চেয়ে মামলা করলো। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ সাব জজ পন্ডিত হরি কিষণ রায়ের রায় অনুযায়ী চবুতরাতে আবেদনকারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু জায়গাটা মসজিদের অতি নিকটে হওয়ায় মুসলিমদের আপত্তি থাকায় সেখানে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হল না।

'সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী' এখানেই থামলেন না। তিনি আপীল করলেন বিচার বিভাগীয় কমিশনার ডবলিউ ইয়ং-এর কাছে। সেখানে নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকলেও বিচারক মন্তব্য করল – 'অত্যাচারী বাবর উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না।' এভাবে রাষ্ট্রশক্তি সুচতুরভাবে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের বীজ বপন করলো। ফলস্বরূপ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে গোহত্যার বিরোধিতা করে সৃষ্টি হওয়া দাঙ্গায় বাবরি মসজিদ ভাঙচূড় করে দাঙ্গাবাজরা। পরে সরকারি খরচে তা মেরামতও করা হয়। শুধু হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নয়, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড মসজিদের উপর কেবলমাত্র সুন্নিদের অধিকার দাবি করে। কারণ বাবর সুন্নি মুসলমান। শিয়া ওয়াকফ বোর্ড প্রতিক্রিয়ায় আদালতে যায়। আদালত শিয়া-সুন্নি উভয়কেই মসজিদ ব্যবহারে অনুমতি দিল। এভাবে শুধু হিন্দু-মুসলিম নয়, বিরোধের নতুন করে বাতাবরণ তৈরি হল শিয়া-সুন্নিদের মধ্যেও।

এদিকে ধর্মের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত দু-টুকরো হবার পর ১৯৪৯ এর ২২শে ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে মসজিদের অভ্যন্তরে রামের মূর্তি ঢুকিয়ে দিল দুস্কৃতিরা। জেলা শাসকের বয়ানে ছিল 'রাতে ১৫ জন পুলিশ ডিউটিতে ছিল। তারা কোনো বাধা দেয় নি।' প্রধানমন্ত্রী নেহরুর হুকুম সত্ত্বেও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের পুলিশ তথা বিচার বিভাগ নিষ্ক্রিয় থাকলো। এমনকী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিল যে মসজিদের বাইরে থাকা চবুতরায় পূজা-আরতির কোনো বাধা থাকবে না, তবে মসজিদ তালা বন্ধ থাকবে। রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এবার বিতর্কিত স্থানটিতে মন্দির নির্মাণ বিধিবদ্ধ হল। কিন্তু এখানে মসজিদটির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হল না।

ওয়াকফ বোর্ড গোপনে ঢোকানো মূর্তির অপসারণের জন্য মামলা দায়ের করলে জনৈক গোপাল সিং বিশারদ এর বিরুদ্ধে ফৈজাবাদ দেওয়ানী জজের আদালতে আবেদন করলো। জজ সাহেব এন. এন. চাড্ডা বিনা বাধায় পূজা-আরতির আবেদন মঞ্জুর করে মূর্তি অপসারণের বিরুদ্ধে ইনজাংশান মঞ্জুর করলো (১৬ই জানুয়ারী ১৯৫০)। এই সমস্ত ঘটনার পর কি বলা যাবে না যে জবরদস্তি মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা হয়েছিল?

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় আদালত রায় দিল যে পূজা যখন চলছে, তখন মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হোক। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ থেকে মসজিদের তালা খুলে দিয়ে সেখানে হিন্দুদের প্রবেশ অবাধ করে দেওয়া হল। হিন্দুত্বের নয়া তত্ত্বকারদের তত্ত্ব অনুযায়ী এদেশের সকলেই সনাতন ধর্মের। তাই যারা সনাতন ধর্ম পালনকারী নয়, তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে আনাটাই ন্যায়, তাই ভিনধর্মীদের আরাধনাস্থল দখল নেওয়াটা অনৈতিক নয়। এভাবে শাসকরা সব কিছুর সমাপতন ঘটালো। এসময়ই বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়ে রাম মন্দির গড়ার আওয়াজ তুলেছিল হিন্দু মহাসভা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য হিন্দুত্ববাদী দলগুলো যখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার হিন্দুদের এনে এই অভিযানে একত্রিত করেছিল তখন কেন্দ্রের সরকার কোনো বাধা দেয় নি। অবশেষে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২, বাবরি মসজিদকে ভেঙে ধ্বংস করে দিল হিন্দুত্ববাদীরা।

মসজিদ ভাঙার জন্য প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়ে প্ররোচনা দানকারী নেতাদের বিরুদ্ধে শুরুতে পুলিশ এফআইআর নিলেও, সিবিআই তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট হাজির করলেও ২০০১-এর মে মাসে সিবিআই আদালত সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা আগেকার সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিল। একই ভূমিকা নিল উত্তর প্রদেশের উচ্চ আদালত (২০১৭-এর মার্চ মাসে)। অবশেষে ২০১৯-এর নভেম্বরে শীর্ষ আদালতের রায় অনুসারে সমগ্র বিতর্কিত জমি দেবতা 'রামলালা'কে দিয়ে দেয়। নির্দেশ দেয় সরকার যেন মুসলিমদের জন্য অন্যত্র পাঁচ একর জমির ব্যবস্থা করে। মসজিদ ভাঙার মামলায় বিশেষ বিচারক এস. কে. যাদবের রায় অনুসারে (৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২০) সমস্ত অভিযুক্ত খালাস পেয়ে গেল।

সকল আইনি বাধা অপসারণের পর মহাসমারোহে ২০২৪-এর ২২শে জানুয়ারী আধুনিক পৃথিবীর মানব সমাজে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। যাঁরা এই উৎসবে সামিল হলেন, তাঁরা যেহেতু এই বিষয়টিকে ঐতিহাসিক কালক্রমে দেখলেন না, তাই তাদের কাছে সমস্ত বিষয়টি স্বাভাবিক লাগতে পারে। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের চোখে ঘটনার কালক্রমিক বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখবো শুরুতে মসজিদে রামমন্দিরের দাবিই করা হয় নি এবং যে স্থানটি দাবি করা হয়েছিল, তা ছিল মাত্র ৩৫৭ বর্গফুট। এভাবেই দেবতার জন্মের মধ্যদিয়ে নয়া হিন্দুত্ববাদের তত্ত্বকারদের আধিপত্যই বকলমে সগর্বে ঘোষিত হল বিশ্বের দরবারে। বাকি মন্দির-মঠের তুচ্ছ হিন্দু ধার্মিকদেরও কার্যত অযোধ্যানগরীতে ঘরবন্দি করে দেওয়া হল। দেবতার এই নবজন্মের জন্য ঐ নগরীর বহুবাসস্থানই নয়, মসজিদ এমনকী মন্দিরও ভাঙা পড়েছে। সেখানে মহাসমারোহে অলৌকিক দেবতার লৌকিক রাজধানী নির্মাণ চলছে। এখন সেটা একটা টুরিস্ট স্পট।

তবু সাধারণ জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা' দিবসে সামিল হলে বা না হলে-ও বুঝছেন যে বেরোজগারী-বেকারত্ব-দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মতো মৌলিক সমস্যাগুলো দু'দিনের উন্মাদনায় সমাধান হবে না। ধর্ম বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যার যার ব্যক্তিগত থাকাই উচিত। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার নিন্দনীয়। বর্তমান শাসকপক্ষের এই এজেন্ডা অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায় নি। তাই শোনা যায় – 'এতো সিরফ ঝাঁকি হ্যায়। মথুরা-কাশি বাকি হ্যায়।' এর কারণ জনগণের উপর অর্থনৈতিক শোষণ যত তীব্র হবে, তত তারা স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যবদ্ধ হবেন। এটা জনতার আগে শাসকের জানা, তাই আগে থেকেই তারা এই সাইড এফেক্টের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ইনজেকশন দিয়ে রেখেছে। একমাত্র সংগঠিতভাবে জনগণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনই এই ওষুধকে অকার্যকরী করতে পারে। ■

বিশেষ রচনা ঃ

জিওর্দানো ব্রুনো – বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী

[১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬০০, ধর্মবাদীদের হাতে শহীদ হন জিওর্দানো ব্রুনো। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে এই নির্ভীক মানুষটি এক আপোষহীন সংগ্রাম করে বিশ্বের কোটি কোটি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কাছে আজও বহ্নিশিখার মত উজ্জ্বল। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪, কলকাতার বেহালায় (সখের বাজার অঞ্চলে) আমাদের দ্বারা আয়োজিত এক সভায় তিনজন বক্তা 'জিওর্দানো ব্রুনো – বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী' শীর্ষক বক্তব্য উপস্থান করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে ওই বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া ওইদিনের অনুষ্ঠানে আয়োজিত শ্রুতিনাটক বহ্নিশিখা-র স্ক্রিপ্টও প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

জিওর্দানো ব্রুনো

আজকে (১৭ই ফেব্রুয়ারী) আমরা যে বিষয়ে এই দিনটিতে উপস্থিত হয়েছি, যে বিষয়ে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, তিনি এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন যাকে শুধুমাত্র সত্যিকথা বলার জন্য জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি হলেন জিওর্দানো ব্রুনো। আজকের এই দিনটিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম দিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ প্রায় তেরোশো বছর ধরে মেনে এসেছে, টলেমী বর্ণীত বা বাইবেল স্বীকৃত মতবাদ, যা ভূকেন্দ্রীক মহাবিশ্বের মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী, এবং পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে অন্যান্য গ্রহ। আজ থেকে চারশো বছর আগে কোর্পানিকাস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অন্য দ্য রেভেলিউশন অফ হেভেনলি স্ফিয়ারস্'-এ উল্লেখ করেন যে সূর্য রয়েছে কেন্দ্রে এবং সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহরা প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু ধর্মের বিরোধিতা হবে এই ভয়ে তিনি এই বিষয়ে প্রচার করে যেতে পারেন নি। এমনকী তৎকালীন চার্চও এই গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল। প্রথম জিওর্দানো ব্রুনো এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। আর সেই কারণেই তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

জিওর্দানো ব্রুনো একজন ব্যতিক্রমী পথ প্রদর্শক। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইতালীর নোলা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একাধারে কবি এবং সৈনিক। তিনি খুব শিশু বয়সে নেপলস্-এর সেন্ট ডমিনিকান স্কুলে ভর্তি হন। তৎকালীন সমাজে চার্চেই বিজ্ঞান চর্চা হোত, লেখাপড়াও হোত। তিনি খুব অল্প বয়সেই ধর্মযাজক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই চার্চে পড়াশুনো চলাকালীন তাঁর হাতে কোপার্নিকাসের সেই নিষিদ্ধ গ্রন্থটি এসে পড়ে। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন। তিনি এই মর্মে উপনীত হন যে সূর্য একটি নক্ষত্র মাত্র। এই সূর্যের মতো মহাকাশে আরো অনেক নক্ষত্র রয়েছে এবং তাদেরকে ঘিরে পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহরা প্রদক্ষিণ করছে। এই সত্যকে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন এবং বই-ও লিখতে থাকেন। শুধু এতেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি যীশুর জন্ম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন যে একজন কুমারী নারীর পক্ষে কখনোই সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিরোধী। স্বভাবতই চার্চের রোষানলে পড়েন তিনি। তখন তিনি ইতালী ছেড়ে পালিয়ে যান।

ইতালী থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি ইংলন্ড, জার্মানি, ফ্রান্স – বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং তাঁর বক্তব্য মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু যেখানেই তিনি বেশিদিন থেকেছেন সেখানেই তিনি নানান বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে ১৫৯১-তে তিনি তাঁর জন্মস্থান ইতালীতে আবার ফিরে আসেন। সেই সময় ইতালীর এক অভিজাত ব্যক্তির চক্রান্তে তাঁকে ইনকুইজিশনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়। ইনকুইজিশন হল তৎকালীন রোমান ক্যাথলিক গির্জার একটা বিচার ব্যবস্থা। যেখানে ধর্ম অবমাননাকারীদের বিচার হতো। ব্রুনোকেও সেই বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজের যুক্তি তুলে ধরেন এবং অন্য যুক্তি খন্ডন করেন।

১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রোমে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে দুবছর ধরে তাঁর বিচার চলে। সেখানে বিচারক তাঁকে ক্ষমা চেয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে নিতে বলে। কিন্তু তিনি নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। স্বভাবতই তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেই কারাগারটি ছিল সীসা দ্বারা নির্মিত। যেখানে গ্রীষ্মের দুপুরের গরমে জল বাষ্পে পরিণত হতো এবং শীতের রাতের ঠান্ডায় রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারতো। এইরকম তাপদগ্ধ দিন আর হিমশীতল রাত্রি-অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ব্রুনোর সত্যনিষ্ঠাকে মাথা নোয়াতে অসমর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৬০০ শতকের ২০শে জানুয়ারী তৎকালীন পোপ অষ্টম ক্লেমেন্ট তাঁকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন এবং তাঁকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেন। এই দন্ডাদেশ শুনে ব্রুনো অত্যন্ত বিদ্রুপের সঙ্গে বলেছিলেন

"আমি তোমাদের এই আদেশ শুনে যতটা না ভীত; আগামী দিনে কি প্রকাশিত হতে চলেছে সেই কথা ভেবে তোমরা তার থেকে অনেক বেশি ভীত এবং সন্ত্রস্ত।"

শেষ পর্যন্ত আজ থেকে চারশো চব্বিশ বছর আগে এই আজকের দিনে অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারী সবার সমক্ষে ব্রুনোকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ব্রুনোকে মেরে ফেললেই তো সত্যকে মেরে ফেলা যায় না, সত্যকে কখনো দাবিয়ে রাখা যায় না। সেটা আমরা দেখতে পাই পরবর্তীকালে গ্যালিলিও একই তথ্য তুলে ধরেন যখন, তখন তাঁর উপরও নিপীড়ন হয়। তাঁকেও প্রায় আট বছর জেলে অকথ্য অত্যাচার করা হয়। এমনকি সে যে দুটি চোখ দিয়ে মহাকাশ দেখেছিল, সেই চোখ দুটি অন্ধ করে দেওয়া হয়।

যাইহোক ব্রুনো শুধুমাত্র একজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী, দার্শনিক বা প্রতিবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আপোষহীনতার এক মূর্ত প্রতীক। আমরা প্রতিদিন যে আপোষের গড্ডালিকায় নিমজ্জিত, ব্রুনো তাঁর সেই আপোষহীন মানসিকতা দিয়ে আমাদেরকে শক্তি জোগান। আমরা, বিজ্ঞান কর্মীরা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত অনেক প্রতিবন্ধকতার শিকার হই, বিভিন্ন ধর্মের কান্ডারীরা তাঁদের কঙ্কালসার আঙুল দ্বারা যখন বিজ্ঞানের গলা টিপে হত্যা করতে রত, তখন ব্রুনো আমাদের তথা বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কাছে অবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি জোগায়। তাই ব্রুনো আমাদের কাছে এক আদর্শ। তাই ব্রুনোকে বিজ্ঞানের জন্য শহীদ বলে আমরা আখ্যা দেই।

৪২৪ বছর পর বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা কি আসুন এখন তা বিচার করে দেখা যাক।

বর্তমান সময়

* বিগত ১৯ জানুয়ারীতে জাপান চন্দ্র অভিযান সফল করল। যানের নাম স্লিম। পৃথিবীর পঞ্চম দেশ, যার আগে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ভারত চন্দ্রযান পাঠিয়েছে।

* কোনো একটা গরমের ছুটিতে হয়তো আমরা দীঘা দার্জিলিং-এ না গিয়ে মহাকাশের টিকিট কাটবো। মামার বাড়ি যেতে হলে যেতে হবে মঙ্গল গ্রহে। ইলন মাস্ক এই গবেষণাই চালাচ্ছেন যে কীভাবে মঙ্গল গ্রহে উপনিবেশ গড়া যায়, মহাকাশে ট্যুরিজম চালু করা যায়।

* ইলন মাস্কেরই সংস্থা স্নায়ুর রোগ নিরাময়ে মস্তিষ্কে চিপ বসানোর কথা ভাবছে।

* আফ্রিকার আগ্নেয়গিরিতে গবেষণামূলক কাজের জন্য অভিযান চালাচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

অর্থাৎ এই যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগ। একদিকে এই চিপ, কম্পিউটার, রকেট, রোবট, হিউম্যান ক্লোনিং, স্যাটেলাইট, আবার অন্যদিকে মহাকাশ, সমুদ্রের তলা, আগ্নেয়গিরি থেকে সম্পদ আহরণ, ভীন গ্রহে বসবাসের সম্ভাবনা – আজকের বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের এই প্রগতিশীল ধারাই সভ্যতার অগ্রগতির চালিকা শক্তি।

কিন্তু একদিকে যেমন বিজ্ঞানের এই ক্রিয়াশীল ধারা রয়েছে, যেখানে গবেষণা, আবিষ্কার, অনুসন্ধান-এর মাধ্যমে একটা উত্তম জীবনশৈলী লাভ হতে পারে, সেরকমই এই বিজ্ঞানের ব্যবহারের একটা প্রতিক্রিয়াশীল ধারাও রয়েছে, যেটাকে প্রয়োগ করা হয় শাসন আর শোষণের অভিপ্রায়ে। বৈষয়িক আর চিন্তাভাবনা দুই ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্ব রয়েছে।

মানুষ চিন্তাশীল জীব। সেই আদিম যুগ থেকেই অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার কৌতূহল তার স্বভাবগত। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কার্যকারণ অনুধাবন করা, সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে বিভিন্ন শক্তি ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সাধান করতে পারে। সত্যকে জানার আগ্রহ থেকে উদ্ভাবন করতে পারে ভাষা, যন্ত্র, রীতিনীতি, কৌশল, তার প্রয়োগ করে বিভিন্ন সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। এই বাস্তবায়নেই মুক্তি। কবির ভাষায়, এই মুক্তি সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশে আর উপলব্ধিতে।

মানুষের চিন্তাভাবনা বহুমাত্রিক। বস্তু জগত সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান তাকে ভাববাদী করে তোলে। ঝড়, বৃষ্টি, দাবানলকে দেবতার রোষ বলে মনে করতে শুরু করে। সেখান থেকে ধর্মের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই মানুষেরই একাংশ সত্যের অনুসন্ধান শুরু করে বিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে। যার জন্যে নতুন তত্ত্ব আর তথ্য উঠে আসতে লাগল। এত দিন ধরে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি ভেঙে যেতে লাগলো। ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিরোধ শুরু হয়ে গেল। এই বিরোধে ধর্ম পেল রাজশক্তির সমর্থন। তারা চার্চ, পোপদের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে লাগলো।

কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও সত্যিকে চেপে রাখা যায় না। শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বিশ্বাসীদেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অস্বীকার করাতে না পারায় ধর্মীয় মৌলবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো এই বিরোধ থেকে বেরিয়ে আসে আর শাসক শ্রেণীর বদান্যতায় অতি সুকৌশলে প্রচার করতে থাকে যে এই সমস্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমস্ত ধর্মগ্রন্থ থেকেই এসেছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের কথাই বেদ, বাইবেল, কোরানে আগে থেকেই লেখা আছে।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সেই বিখ্যাত উক্তি "সবই ব্যাদে আছে" কে না জানে! একবার বিদেশ থেকে ঢাকায় ফিরলে তাঁর সাথে এক বিখ্যাত উকিলের দেখা হয়। বিজ্ঞানী মহলে ততদিনে

তিনি খ্যাতি পেতে শুরু করেছেন। উকিল মহাশয় তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজ নিয়ে উৎসুক ছিলেন। বিজ্ঞানী সাহাও প্রচন্ড উৎসাহিত হয়ে তাঁর গবেষণার সমস্ত খতিয়ান দিতে লাগলেন। কিন্তু একটু পর পরই উকিল মহাশয় বলে উঠতে লাগলেন "এ আর নতুন কী, এ সমস্তই ব্যাদে আছে"। বিজ্ঞানী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বেদে কোথায় আছে, আমাকে একটু অনুগ্রহপূর্বক দেখিয়ে দিন। উত্তরে উকিল বলেন "আমি তো কখনও ব্যাদ পড়ি নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস নতুন বিজ্ঞানে তোমরা যাহা করিয়াছ বলে দাবি কর সমস্তই ব্যাদে আছে"।

এরপর তিনি ২০ বছর ধরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, হিন্দুশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বর্তমান বিজ্ঞানের কোনো মূলতত্ত্ব খুঁজে পাননি।

তাঁর মতে "সকল প্রাচীন সভ্যদেশের পণ্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির গতি, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ, নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।"

শুধু বেদ কেন, এরকম আপনারাও শুনেছেন, কিছু একটা আবিষ্কার হলে একদল বলে ১৪০০ বছর আগেই কোরানে নাকি তার কথা উল্লেখ ছিলো বা বাইবেল অনেক আগেই এর ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া হয়েছিল।

যেমন আমাদের নবগ্রহে ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো ছিলো না। মনে করা হতো পৃথিবী কেন্দ্রে, তার চার পাশে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র গ্রহ আছে আর আছে সূর্য বা রবি, আর রাহু ও কেতু। বাইবেলও বলতো সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ব্রুনো-গ্যালিলিও-কোপার্নিকাস যখন বাস্তবটা তুলে ধরলেন স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় গুরুরা সেই তত্ত্ব খারিজ করলেন। তারা বলেন সবই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। তিনি যেভাবে সমস্ত কিছু চালনা করছেন সব কিছু সেই ভাবেই চলছে। এটাই চিরসত্য।

তারা বলেন সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্টির কথা আর বিজ্ঞান বলে বিবর্তনের কথা। বিজ্ঞান যুক্তি প্রমাণ দিয়ে সবকিছু বিশ্লেষণ করে। কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতার তার কাছে কোনো স্থান নেই।

কিন্তু চিন্তাচেতনার সাংস্কৃতিক জগতে এই দ্বন্দ্ব কেন? বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগেও চিন্তাচেতনার সাংস্কৃতিক জগতে, সমাজজীবনে এই নেতিবাচক প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? একদিকে এত কম খরচায় চন্দ্রাভিযান সফল করতে পারছি আবার অন্য দিকে উৎক্ষেপণের আগে পুজো দিচ্ছি আর সেই জায়গায় পৌঁছেও তার নামকরণ ভগবানের নামে করছি। কেন? কারণ, বিজ্ঞানের প্রগতিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চুপ করে বসে থাকবে না। এতে তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিঘ্নিত হবে।

আর ধর্ম দুই তরফের মানুষেরই কাজে লাগে, ক্ষমতাবান প্রিভিলেজড মানুষদেরও আবার ক্ষমতাহীন ডিপ্রাইভড মানুষদেরও। প্রথমে আসি ক্ষমতা কেন ধর্মকে ব্যবহার করে।

ধরুন, গণেশ যদি দুধ খায়, আর যদি এটা প্রচার করা যায় যে ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, কলি যুগের অবসান হয়ে কল্কি যুগ আসতে চলেছে। মানব জীবনের ইতি ঘটতে চলেছে। তাহলে ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। মানুষকে অধিকারের লড়াই থেকে বিরত রাখা যাবে।

আর তখন যদি কেউ পৃষ্ঠটান, রাসায়নিক বিক্রিয়া, কণার মধ্যবর্তী ফাঁকের তত্ত্ব নিয়ে আসে তাকে কী বলতে দেওয়া হবে? এ গেল রাজনৈতিক কারণ।

এবার আসুন অর্থনৈতিক কারণে। আজকের বাজারে চাকরি নেই। যতই খরচা করে শহরে গিয়ে পড়ুক আর বিদেশে গিয়ে পড়ুক চাকরি নেই, আর থাকলেও সেই মাইনে নেই যতটা থাকা উচিৎ। তার কারণ, আমাদের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এমনই, যেখানে ধনী আরও ধনী হবে, গরীব আরও গরীব। এই বৈষম্য বাড়তে বাড়তে আজ এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে 'যেখানে ম্যাক্সিমাম সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে আর মুষ্টিমেয় সম্পদ ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে।' কিন্তু গরীবরা এত গরীব হয়ে গেছে যে তাদের আর ক্রয় ক্ষমতা নেই, সে চারচাকাই হোক আর চা-বিস্কুটই হোক। এর ফলে উৎপাদিত

সামগ্রী বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। উৎপাদন কমাতে হচ্ছে। কর্মস্থানও কমাতে হচ্ছে। চাকরি ছাঁটতে হচ্ছে। এতে তাদেরও লাভের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। পুঁজিবাদ সংকটে।

এখন তারা কী করবে? সংকটের পেছনে এই বিজ্ঞান সাধারণ মানুষ বুঝিয়ে শাসকশ্রেণীর বিপদ ডেকে আনবে নাকি এই অভাব, অভিযোগ, বৈষম্য, শোষণ ধামাচাপা দিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে, এই বলে যে দেখো, অমুক জায়গা থেকে তমুক গোষ্ঠী এসে তোমাদের চাকরি খেয়ে নিচ্ছে, এর পেছনে পাশের রাজ্য, পাশের দেশের ষড়যন্ত্র আছে। বা ভগবান রুষ্ট হয়েছে। তার জন্য আগে আমাদের ভগবানকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য মন্দির, মসজিদ বানাতে হবে।

যখন তাদের শোষণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় তখন মানুষকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে বিভাজন তৈরিতে ধর্মকে ব্যবহার করে।

সাধারণ মানুষ কখন ধর্মের জালে জড়িয়ে পড়ে?

এই যে এত সংখ্যক সর্বহারা শ্রমিকের চাকরি আর রোজগারের সংকট তৈরী হচ্ছে, বা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের দাপটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, এতে তাদের ভবিষ্যত সংকটে পড়ে যাচ্ছে। এই সময় তাদের দরকার একটা অবলম্বন বা অভিভাবক, যে তাঁদের কথা শুনবে আর পরিত্রানের ব্যবস্থা করবে। কার কাছে যাবে, সরকার? সে কি শুনবে? এরকম একটা আনস্টেবল অবস্থায় সাময়িক শান্তি পেতে তারা সৃষ্টকর্তার, তাদের কাল্পনিক অভিভাবকের স্মরণাপন্ন হয়।

এই জন্য দেখবেন যেখানে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় সেখানে ধর্মীয় কার্যকলাপও বৃদ্ধি পায়।

তাই যতই আমরা রোবটকে দিয়ে ঘর মোছাই, সুদ্ধিকরণের জন্য তাতে গঙ্গাজল দেবো, ভগবানের যেখানে থাকার কথা রকেটে করে সেই মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার আগে ভগবানের কাছে মানত করব। সেখানে গিয়ে তাকে দেখতে না পেলেও ফিরে এসে আবার তার পুজো করব, যতই মাথায় চিপ সবাই, গোমূত্র দিয়ে ক্যানসার সারানোর চেষ্টা করব, গরুর দুধে সোনা খুঁজব, গণেশ বা নন্দীকে দুধ খাওয়াবো, মাহিম ফাঁড়ির মিষ্টি অথচ বিষাক্ত জল খাবো, যিশু বা মেরির মূর্তিকে কাঁদতে দেখবো, মক্কার ওপর ঘোড়া উড়তে দেখবো।

তারা কি চাইবে এই বিজ্ঞান ফাঁস হয়ে যাক? তাহলে কি তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে? তারা কি আমাদের এর থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে না?

আমরা একটা কথা প্রায় শুনতে পাই যে, কেউ প্রশ্ন করে না। কেন করে না? কারণ, রাষ্ট্র আর ধর্ম আমাকে শিখিয়েছে সেই কথা। রাষ্ট্র কীভাবে শেখালো? কখন শেখালো? সেই স্কুলে।

স্কুলে কী বলা হয়েছিলো? এই তোমার পাঠ্যবই, যা আছে এতেই আছে। ঐ একটাই উত্তর তোমায় জানতে হবে। কেউ ঘুরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে কী বলা হতো? একদম পাকামি করবি না, বস চুপ করে। ভালো ছেলেমেয়েরা মুখে মুখে তর্ক করে না। কারণ ঐ শিক্ষক-শিক্ষিকাও এই এডুকেশান সিস্টেমেরই ফসল। ঐ বকা খাওয়ার ভয় আর ভালো সাজার ইচ্ছে আমাদের বড় হওয়ার পরেও থেকে গেছে।

একই জিনিস ধর্মেও দেখতে পাবেন। এই তোমার ধর্মগ্রন্থ। যা আছে এতেই আছে, যা এতে নেই তা কোথাও নেই। এটাই চিরসত্য। একে প্রশ্ন করার বা অস্বীকার করার জায়গা নেই। নাহলে স্কুলে ছড়ি দিয়ে মারতাম, এখন ছুড়ি দিয়ে মারব।

এরপরেও প্রগতিশীল মানুষদের ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। কিছু মানুষ প্রশ্ন করে গেছেন। উত্তরও দেখিয়ে গেছেন। ব্রুনো-গ্যালিলিও-কোপারনিকাসের নাম আগেই করেছি। মৃত্যু তাদের চুপ করাতে পারেনি। আজ সত্যিটা সবাই মেনেছে।

একইভাবে আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর পুরনো রীতিনীতি ভেঙে সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা রদ করেছেন। যদিও এক্ষেত্রে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চালিত ব্রিটিশ সরকার কিছুটা সাহায্য করেছিলো। পুঁজিবাদ এমন একটা ব্যবস্থা, তার স্বার্থে সামন্ত প্রথা অবসান করে নিজে ক্ষমতায় আসতে বিজ্ঞানের সাথে হাত মেলায়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব, যা একটা বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড, এই পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ঘটে।

আবার সংকটে পড়লে ধর্মের সাথে হাত মিলিয়ে শাসককে বিজ্ঞানের বিকাশের পথে বাধাও হতে সাহায্য করে।

শাসকশ্রেণী এই বাধা প্রদানে ৪ রকম পন্থা অবলম্বন করে।

১। বিজ্ঞানভিত্তিক সভা, মিছিল, সেমিনার বন্ধ করে দেয়।

২। শাসক ও তার প্রতিভূদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার স্বার্থে পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলিতে বাধা প্রদান করে।

৩। আবার সেই স্কুল। মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ যাতে না ঘটে তাই বিবর্তনবাদ, পর্যায়সারণী বাদ দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রর মতো অবৈজ্ঞানিক বিষয় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত করে।

৪। শারীরিক আক্রমণ নামিয়ে এনে গৌরী লঙ্কেশ, কালবুর্গী, গোবিন্দ পানসারে, নরেন্দ্র দাভোলকর, বাংলাদেশের অভিজিত রায়, অন্তত বিজয় দাস, নিলয় নীল, ওয়াসিকুর রহমান, পাকিস্তানের প্রফেসর জুনায়েদ হাফিজ-এর মতো বহু যুক্তিবাদী আর মুক্তমনাদের শাসকের মদতে খুন করা হয়।

তবে হতাশার কোনো জায়গা নেই। সত্যিকে চেপে রাখা যায় নি, যায় না। সমাজে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শক্তির যেমন ঐক্য রয়েছে তেমন সংঘাতও রয়েছে। লড়াই আন্দোলন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে সমাজে গুণগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। পুরাতন ধ্যানধারণা বিলুপ্ত হয়ে নতুনের আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে।

কিশোর কবি সুকান্ত তাঁর ছাড়পত্র কবিতায় অঙ্গীকার করেছিলেন,

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি –
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস ॥

কবি সুকান্ত'র স্বপ্ন আমাদের সবার চোখে। আগামী পৃথিবী প্রতিটি মানুষের বাসযোগ্যের উপযোগী করে গড়ে তুলতে লড়াই আন্দোলন জারি থাকবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রচিত হবে নতুন ইতিহাস।

আগামী পৃথিবী

জিওদার্নো ব্রুনোর জীবনকাল ১৫৪৮ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ। বলা হয় তাঁর জন্ম ও জীবনকাল ছিল মধ্যযুগীয় ধর্মীও ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়াশীলতা ও আধুনিক যুক্তবাদের সন্ধিক্ষণে।ব্রুনোর চোখ খুলে দিয়েছিল ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, নিকোলাস কোপার্নিকাস রচিত একটি বই। এই বইতে উল্লিখিত ছিল যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করছে। মনে রাখার বিষয় এই যে সে সময় টেলিস্কোপ বা দূরবীনের আবিষ্কার হয় নি। মানস চোখে প্রায় সমতল চ্যাপটা পৃথিবীর আকাশে সূর্যকেই পৃথিবীকে আবর্তন করতে দেখা যেত। বাকি মহাকাশকে খালি চোখেই পর্যবেক্ষণ করতে হোত। কিন্তু তিনি কোপার্নিকাসের যুক্তিকেই মেনে নিয়েছিলেন বৌদ্ধিকভাবে।

যদি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে ব্রুনোর জীবনকালটা ছিল সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের আগমনের অন্তর্বর্তী পর্যায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের কারণে মানুষের বৈষয়িক জীবনে উৎপাদনের পরিমাণে ও গুণে ততটা পরিবর্তন হয় নি, যতটা হয়েছে শিল্প বিপ্লবকালে। সে কারণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তুলনামূলকভাবে বিকাশ হয়েছে সামান্যই। তবুও উৎপাদনে এক প্রবল তাড়নার সৃষ্টি হয়েছিল। বণিকরা সমুদ্র যাত্রা করছেন, পণ্য নিয়ে অন্য মহাদেশে চলে যাচ্ছে, আবার পণ্য আমদানিও চলছে। পণ্য উৎপাদন যেহেতু প্রাকৃতিক বস্তুকে শ্রম দ্বারা পরিবর্তন করা, তাই বিজ্ঞানকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতেও এক সামাজিক চাহিদা গড়ে উঠছিল। এ কারণেই যুক্তিবাদের উন্মেষ দেখা গেছিল তখন। একই সঙ্গে ধর্মের কান্ডারীরা বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রবলভাবে এদের দমন করছে। সেকারণে কোপার্নিকাস ছিলেন সে সময় নিষিদ্ধ। আর কোপার্নিকাসের ভাবশিষ্য জিওদার্নো ব্রুনোকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে সত্যের সন্ধানী হওয়ায়।

পুঁজিবাদের বিকাশ, মানব চিন্তারও বিকাশ ঘটিয়েছিল। বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্বের মান্যতা দিতেই হয়েছিল শাসককূলকে। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক চার্চ অবশেষে কোপার্নিকাস অধ্যয়নে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।

সে যুগে ব্রুনোকে যেমন মরতে হয়েছিল অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য। এযুগেও নরেন্দ্র দাভালকর, গোবিন্দ পানসার কিংবা এম.এম. কালবুর্গিদেরও একই কারণে মরতে হয়। বোঝা যায় অলৌকিকতা-অন্ধবিশ্বাসের স্বপক্ষে শাসকদের অবস্থান একই রয়েছে। ব্রুনোর জীবনকালের চারশো বছর পরেও এমন ঘঠনা ঘটে। যখন খালি চোখে আকাশ দেখতে হয় না, মানুষের মহাকাশ যানে চড়ে পাঠানো হাবল্ কিংবা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ মহাবিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তকে ধরতে চায়।

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করি, সে যুগে সমাজের অতি মুষ্টিমেয় পুঁজির মালিকশ্রেণী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সকল কিছুর মালিক। এই সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে বিকাশ হয়েছে, তা বিশ্ব জনসংখ্যার ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদিত হচ্ছে। অজানাকে জানার প্রয়াসও অব্যাহত আছে। যদিও সমাজের অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজন এতে মিটছে না। এবং অজানাকে জানা তথা জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসার ধারাবাহিকভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এর কারণ কি?

সমাজ বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি মানব সমাজ তার সূচনাকাল থেকেই উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে। একটি সমাজের গর্ভে পরবর্তী সমাজের ভ্রূণের জন্ম হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়। যেমন আধুনিক পুঁজিবাদী তথা মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই সামাজিক মালিকানা, সামাজিক বন্টনের ব্যবস্থা তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভ্রূণ বিকশিত হয়ে চলেছে চোখের আড়ালে। এই পুঁজিবাদ একচেটিয়া স্তরে পৌঁছনোর পর অতি উৎপাদনের সংকটে জর্জরিত হয়ে বিকাশের সমস্ত শর্ত হারিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নিয়েছে। তাই সে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে উৎপাদিকা শক্তিকে ধ্বংস করছে, অর্থাৎ কলকারখানাকে বন্ধ করছে, শ্রমিক ছাঁটাই করছে। আর

অন্যদিকে সমাজ প্রগতির বিপরীত প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রাখতে চাইছে। ধর্মের নামে-জাতির নামে-ভাষার নামে-বর্ণের নামে শ্রমজীবী মানুষকে ভাগ করে শাসন শোষণ জারি রাখতে চাইছে। প্রগতির পক্ষের সকল ক্রিয়াকলাপের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। এটা বস্তুর একটি দিক মাত্র। অপর দিক হল শাসকশ্রেণীর এই শোষণ-দমন-নিপীড়নের ক্রিয়াকলাপ তার অবস্থানকে সুদৃঢ় না করে আরো দুর্বল করে চলেছে। যে পরিস্থিতিতে রাজা তার প্রজাকে গোলাম হিসেবে খাইয়ে-পড়িয়ে-বাঁচিয়ে রাখার যোগ্যতা হারায়, সেই পরিস্থিতিতে প্রজার কাছে রাজার মান্যতাই বিনষ্ট হয়। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজে সামাজিক উৎপাদন এবং সামাজিক মালিকানার প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অর্থাৎ সমাজ সমাজতন্ত্রের পূর্বাহ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজশক্তির মাধ্যমে কণ্ঠরোধ, দমন-পীড়ন ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের প্রচার-প্রসার দিয়ে এই নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যে লড়াই আজ থেকে প্রায় চার শতাধিক বছর আগে শহীদ ব্রুনোরা শুরু করেছিলেন, সেই লড়াই বর্তমানে শেষ যুদ্ধের মুখোমুখি।

তাই শোষণ-শাসন-দমন পীড়ন এবং অন্ধত্ব ও কুসংস্কার মানব প্রগতিতে গ্রাস করে নিতে পারবে না। সচেতন শ্রমজীবী জনতা এই প্রতিক্রিয়াশীল পচনধরা পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভে জন্ম নেওয়া আপামর মানুষের স্বার্থে বিকশিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেই। পৃথিবীর বুকে সকল শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা পরিচালিত এবং মানুষের স্বার্থের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঝলক আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্বতন নয়া গণতান্ত্রিক চীনে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে ঐ দুই রাষ্ট্রে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান, নারীর অধিকার, সমাজের সকল মানুষের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ, সমাজে টিঁকে থাকা সকল অন্ধকার ও কুসংস্কারকে মুক্ত করার এক বিরাট ঝড়ের উৎপকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছে।

আজ দুনিয়ার দিকে দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির সুফল সমাজের সকলের মধ্যে সমানতার ভিত্তিতে বন্টনের দাবি উঠছে। ধর্মবাদ, ঈশ্বরবাদ, অলৌকিকতার মত প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার এবং শোষণ-বৈষম্যের অবসানের জন্য সংগ্রাম একাকার হয়ে গেছে। এই সংগ্রামের বিকাশের জন্য সকল বিজ্ঞান মনস্ক ও প্রগতিশীল জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই সংগ্রামের বিজয়ই শহীদ ব্রুনোর আত্ম-বলিদানকে সফল করতে পারে। ■

পাঠকের কলাম ঃ

যুক্তিবাদী মানুষকে মারলে যুক্তি মরে না তার হাত বদল হয় মাত্র

– দেবস্মিতা

এক বাপ মা মরা অনাথ বাচ্চা। তাঁকে নিয়ে আসা হল ধর্মের আশ্রয়ে – গির্জায়। ধর্মের আবহে মানুষ হল সে। কিন্তু বাচ্চার মনে কোনও কৌতূহল জাগলেই থামিয়ে দেওয়া হত। বলা হত, পরমপিতার ইচ্ছেয় সব হচ্ছে। সেখানে প্রশ্ন করা মানা। পেরিয়ে গেল অনেকগুলো দিন। তাঁর মনের দ্বন্দ্ব বাড়তেই থাকল ...

সেই বাচ্চাই একদিন বড় হয়ে ধর্মের দিকে বড়সর আঙুল তুলল।

সালটা ১৬০০। ব্রুনোকে মরতে হয়েছিল সমাজকে সত্য দেখানোর অপরাধে। ধর্মকে প্রশ্ন করার অপরাধে। আর আজ এতগুলো শতাব্দী পেরিয়েও ব্রুনো রয়েছেন। রয়েছে তাঁর ভাবধারা। তাঁকে হত্যা করার দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে পালিত হল ব্রুনো দিবস। বিজ্ঞানমনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল এমনই একটা দিনের। সেখানে নানান আলাপ আলোচনার সঙ্গে ছিল একটা শ্রুতিনাটক সেই মহান মানুষটির জীবন ঘিরে – বহ্নিশিখা।

কচিকাঁচারা মিলে পরিবেশন করল নাটকটি। সবচেয়ে বড় বাচ্চাটি ক্লাস নাইনের পড়ুয়া। সেই ব্রুনো। তার গলায় অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে ব্রুনোর জীবনের নানান টানাপোড়েন, বন্ধু অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে মধুর সম্পর্কের কথা। যেখানে ব্রুনো বলছেন, তিনি অ্যাঞ্জেলার কাছে এলে যে শান্তি পান সেটা গির্জায় পান না কেন!! সঙ্গে সঙ্গেই গির্জার যাজকের চোখ রাঙানি। ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। সেই সময়কার অবস্থা খুব সূক্ষ্ম বিষয়ের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রুতিনাটকের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ঝুমা সমাদ্দার। এত সুন্দর পরিচালনা। কিছুক্ষণের জন্য যেন পিছিয়ে যেতে হয় সেই যুগে। শিশু ব্রুনোর মধ্যে কিভাবে ধর্মের বিষ পুরে দেওয়া হয় সেটা যেমন এসেছে তেমনই এসেছে সব কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় কী নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে। অথচ তিনিও ছিলেন প্রথম জীবনে একজন ধর্মপ্রচারকই। ধর্মবিরুদ্ধ কথাই কাল হল তাঁর।

ব্রুনোরা আছে। আজও আছে। তাঁদের নাম ভিন্ন। কারও নাম গোবিন্দ পানসারে, কারও দাভেলকর, কারও কালবুর্গী আবার কারও অভিজিৎ রায় কিংবা অন্য কোনও নাম। তাঁরা নিপীড়িত হয়, লাঞ্ছনা সহ্য করে। তারপরও মাথা তুলে দাঁড়ায়। পথ দেখায়। উদ্বুদ্ধ করে আরও কিছু মানুষকে। দিশা দেখায় আগামী প্রজন্মকে। ■

শ্রুতিনাটক ঃ

বহ্নিশিখা

– ঝুমা সমাদ্দার

১

বিবেক – হ্যালো ... হ্যালো ... স্যার ... দাভলকর স্যার, ভাল আছেন তো? চোখে দেখতে পাচ্ছেন তো এখন? আপনার মত একজন যুক্তিবাদী, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াকু চিকিৎসককে তো ধর্মের ধ্বজাধারীরা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে চোখে গুলি করে মেরেছিল। দেখতে পাচ্ছেন এখন? দেখতে পাচ্ছেন আগামীদিন? পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে রেখে যাওয়ার স্বপ্ন আপনি এখনও দেখতে পান?

দাভলকর – আলবৎ। না দেখার তো কিছু নেই। তুমি কি মনে কর, একজন দাভলকর মরলেই সত্যটা মিথ্যে হয়ে যায়? না হে! ওই দেখ, আমার পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো গোবিন্দ পানসারে, এম. এম. কালবুর্গি, অভিজিৎ রায়, গৌরি লঙ্কেশ। এমন আরও আসবে আগামীদিনে। ধর্মের মুখোশধারীরা জানে না, একজন যুক্তিবাদী মরলেই যুক্তিবাদ মরে না। ব্যাটন ধরা হাতটা বদলে যায় শুধু। মনে কর, সেই সক্রেটিস, গ্যালিলিওর কথা। মনে কর, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রথম শহীদ ব্রুনোর কথা। সেই শিশুকালে বাবা-মা হারানো অনাথ বালকটির কথা ...

২

ব্রুনো (ছেলেবেলা) –

ব্রুনো – এটাই? এটাই কি ডমিনিকো চার্চ? আমি আশ্রয় পাব এখানে? খেতে পাব? রোজ?

ফাদার (ডমিনিকো চার্চ) – কাম, কাম, মাই বয়। দয়াময় পরমপিতা তোমাকে রক্ষা করবেন। হোয়্যাটজ্ ইওর নেম?

ব্রুনো – ফিলিপ্পো ... মা ডাকতেন। আর ... আর .... হ্যাঁ ... আমার শিক্ষক, জিওর্দানো ক্রিস্পো ... প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন আমাকে ... আমি ... আমি ... ফিলিপ্পো নই ... আমি জিওর্দানো ব্রুনো।

ফাদার – সি মাই বয়, তুমি এখানে থাকবে। লেখাপড়া করবে। চার্চের প্রচুর ধর্মীয় বই আছে। সর্বদা বিশ্বপিতার কাছে প্রার্থনা করবে, তিনি যেন তাঁর দয়ার ছত্রছায়ায় তোমাকে রাখেন। তাঁর বিরাগভাজন হয়ো না কখনও। তিনি দয়াময়।

ব্রুনো – দয়াময়? দেন হোয়াই শুড আই প্রে টু হিম? আর, এই যে আমি বাবা-মা'কে হারিয়ে আজ অনাথ, তাহলে তাঁর দয়া থেকে আমি বঞ্চিত কেন?

ফাদার – ব্রুনো !! হাউ ক্যান ইউ আস্ক কোয়েশ্চেনস টু হিম, দ্য গ্রেট লর্ড !!!

ব্রুনো – বিকজ হি ইজ মাই ফাদার, হি ইজ আওয়ার ফাদার। তিনি দয়াময়।

৩

(যুবক ব্রুনো)

এ্যাঞ্জেলা – কে? কে ওখানে? ওঃ! ব্রুনো। এসো। ঘরে এসো। ভালো করেছ তুমি আজ আমার ঘরে এসে। গতকাল গুডফ্রাইডের অনুষ্ঠানে খুবই খাটাখাটনি হয়েছে। তুমি এলে। গল্প করি এসো।

ব্রুনো – আমিও খুব অস্থির হয়ে আছি, এ্যাঞ্জেলা। চার্চের এই বাঁধাধরা জীবনে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমার কাছে এলে আমি একটু শান্তি অনুভব করি।

এ্যাঞ্জেলা – কি বলছ, ব্রুনো!! আমি কি তোমাকে শান্তি দিতে পারি। শান্তি দিতে পারেন একমাত্র করুণাময় ঈশ্বর। চার্চে লেখা দেখোনি, 'কাম টু মি ফর হিলিং।'

ব্রুনো – বাট ... বাট এ্যাঞ্জেলা, এসব ছেঁদো বাক্যিবুলি আমার ভালো লাগে না। মনে আমার অনেক প্রশ্ন। অনেক জানার ইচ্ছে। চোখ বন্ধ করে 'খ্রীষ্টই শেষ কথা' কিম্বা 'বাইবেলই সত্য' কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। ভেতরে আমার অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। আমার মনে হয়, সত্য আরও অনেক প্রসারিত। অনন্ত। গভীর। আর ... আর ... একটা কথা, এ্যাঞ্জেলা। আমি পবিত্র যীশুর সামনে দাঁড়ানোর চাইতে তোমার সামনে দাঁড়ালে আমি অনেক বেশি শান্তি পাই।

এ্যাঞ্জেলা – তুমি এলে আমারও ভাল লাগে। কিন্তু, এ বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সর্বদা মনে হচ্ছে, আমি কি ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলছি? আমার কর্তব্যে অবহেলা করছি? আমিও তোমারই মত শিশুকাল থেকেই অনাথ। চার্চই আমার আশ্রয়দাতা। পরমপিতার প্রতি আমার অনুগত থাকা উচিত।

ব্রুনো – আমার এই আনুগত্যের ফাঁসে দমবন্ধ হয়ে আসে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, গীর্জা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই।

এ্যাঞ্জেলা – তুমি চার্চ ছেড়ে চলে যাবে? কোথায় যাবে ব্রুনো? ফ্লোরেন্সে? নাকি ইতালিই ছেড়ে যাবে?

ব্রুনো – জানি না। কিছুই ঠিক করিনি। আচ্ছা, তুমি কোপার্নিকাসের নাম শুনেছ?

এ্যাঞ্জেলা – হ্যাঁ শুনেছি। তিনি তো চার্চের পাদ্রীই ছিলেন। আকাশের কথা নিয়ে নাকি বইও লিখেছিলেন?

ব্রুনো – হ্যাঁ, এ্যাঞ্জেলা। আমি পড়েছি সে বই। রোমের লাইব্রেরীর পেছনে পড়েছিল। সম্ভবতঃ, সে বইয়ের অস্তিত্বের কথা পাদ্রীদেরও অজানা ছিল। বাইবেল বলছে, পৃথিবী মহামহিম ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাই, সে অচল, অবিনশ্বর, স্থির। সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমন করছে। পৃথিবীই মহাবিশ্বের কেন্দ্র। কিন্তু, কোপার্নিকাস সে বইতে লিখেছেন, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

এ্যাঞ্জেলা – না না না। এসব শাস্ত্রবিরোধী কথা চিন্তাও কোরো না।

ব্রুনো – শাস্ত্রবিরোধী? তাহলে কি আমরা সত্যের কথা বলব না? অন্ধভাবে ধর্ম অনুসরণ করে চলব?

এ্যাঞ্জেলা – ব্রুনো, আমরা তো ছোটো থেকে 'ধর্মই সত্য' – একথাই জেনে এসেছি। ধর্মের উপরে তো কিছু নেই?

ব্রুনো – যা জেনেছ, প্রশ্ন না করে জেনেছ। যা বিশ্বাস করেছ, বোঝার চেষ্টা না করেই বিশ্বাস করেছ। তোমার মনে প্রশ্ন জাগে না, এ্যাঞ্জেলা, দেবতা যীশুর মূর্তির কাছে নয়, আমার কাছে এলেই তুমি কেন বেশি খুশী হও?

এ্যাঞ্জেলা – জাগে। জাগে এসব প্রশ্ন। কিন্তু এসব কথা ভাবতে আমার ভয় করে। আমরা ভুল করছি না তো, ব্রুনো? এ অনুভূতি হয়ত নেহাতই পার্থিব অনুভূতি, ব্রুনো ...

ব্রুনো – মহাবিশ্বের সমস্তই যদি একই পদার্থের দ্বারা তৈরী হয়, সমস্ত অনুভূতির চালক যদি একই পদার্থ হয়, তাহলে তার কিছু স্বর্গীয়, আর কিছু পার্থিব হয় কেমন করে এ্যাঞ্জেলা?

এ্যাঞ্জেলা – এমন করে বোলো না ব্রুনো ... এসমস্তই ভুল ... ভুল ... অন্যায় ...

(বিশপের আগমন।)

বিশপ – ওঃ, ব্রুনো, তুমি এখানে? কোন ভুলের কথা বলছিলে তুমি, এ্যাঞ্জেলা?

ব্রুনো – মহান বিশপ! আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

বিশপ – বলো ব্রুনো। তুমি প্রতিভাধর। তোমার তো প্রশ্ন থাকবেই। প্রশ্ন থেকেই তো মানুষ ঈশ্বরকে জেনেছে।

ব্রুনো – আমি আর এ্যাঞ্জেলা আলোচনা করছিলাম, মহান পরমপিতা যীশুর মূর্তির কাছে গেলে আমরা মনে শান্তি পাই না, যতটা পাই আমরা পরস্পরের কাছে থাকলে। এই অনুভূতি তো সত্য ফাদার। এই সত্যকে এড়িয়ে চলব কেন? এ ছাড়া আমি কোপার্নিকাস পড়েছি। তিনি পাদ্রী হয়েও ধর্মের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার করেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা আমার অনেক সন্দেহের নিরসন করেছে।

বিশপ – সন্দেহ !!! বাইবেলকে সন্দেহ !!! তুমি জাননা, কোপার্নিকাস ছিলেন ধর্মশাস্ত্র বিরোধী? তাঁর গ্রন্থ নিষিদ্ধ? আর এ্যাঞ্জেলার সঙ্গে তোমার যে সম্পর্কের ইঙ্গিত তুমি করছ, তা যে রীতিমতো কদর্য! তোমরা চার্চকে অপবিত্র করেছ। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চার্চ থেকে দূর হয়ে যাও। পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

৪

(নোলা থেকে ফ্লোরেন্স)

ব্রুনো – মাই ডিয়ার চিলড্রেন, তোমরা প্রশ্ন কর। সত্য অনুসন্ধান কর। ফ্লোরেন্সের এই লাইসিয়ামের প্রাচীরের বাইরে যে জগৎ, যে মহাবিশ্ব অপেক্ষা করছে, তার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের চেষ্টা কর। স্থবির ভাবনাকে মনে স্থান দিও না।

গেভান্নি (ছাত্র) – স্যার, তাহলে এতদিন আমরা যা জেনে এসেছি, সমস্তই কি ভুল? ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেন নি? স্বয়ং যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন? এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর অবস্থান নয়? বাইবেল ভুল?

ব্রুনো – গেভান্নি, বাইবেলের সমস্ত ব্যাখ্যা অভ্রান্ত নয়। মহাবিশ্ব যখন অসীম, এর উপরে কোনো বস্তুকেই প্রকৃতপক্ষে এর কেন্দ্র বা সীমানা বলে নির্দিষ্ট করা যায় না। আরও জেনে রেখ, বস্তুর যে এত রকম অসংখ্য রূপ আমরা দেখতে পাই, এর কোনোটাই বাইরে থেকে বা অন্য কোনো কিছু থেকে আসে না, বস্তু থেকেই বস্তুর জন্ম হয়, বিকাশ হয়। ... ফলে বস্তু প্রকৃতিতেই নানান রূপে আছে, সব কিছুর জন্মরহস্য প্রকৃতির ভেতরেই লুকানো আছে।

সমস্ত ইওরোপ জুড়ে যে নবজাগরণের হাওয়া উঠেছে, তার আলোয় আলোকিত হও তোমরা। আমাকে হয়তো শীঘ্রই ইতালি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

গেভান্নি – কেন স্যার? আপনি ইতালি ছেড়ে যাবেন কেন? আপনি আপনার জানা সত্য গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করুন। সৌরজগতের কথা, ব্রহ্মাণ্ডের কথা, যুক্তির পথে সত্যকে জানার কথা প্রকাশ করুন।

ব্রুনো – তোমরা হয়ত জান না, আমি নোলার গীর্জা থেকে বিতাড়িত। যাজকদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা মনে করছেন, বাইবেলের বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকলে হয়ত মানুষ ক্রমশঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করবে।

গেভান্নি – না না, স্যার। ইউ ডোন্ট নিড টু গো এনিহোয়্যার। প্রয়োজনে আপনি আমার বাড়িতে আশ্রয় নেবেন। আপনার ভয় নেই। আমার বাবা এই শহরের একজন অভিজাত ব্যারন। তিনি এই লাইসিয়ামের কর্তৃপক্ষেরও একজন।

ব্রুনো – ধন্যবাদ গেভান্নি। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তবে, মনে রেখ গেভান্নি, রজার বেকন, আন্দ্রেয়াস ভেসালিউস, মিগুয়েল সারভেতো যখন বলছেন, 'মহামারী ঈশ্বরের রোষে নয়, প্রাকৃতিক কারণে ঘটে', কিম্বা 'মানব শরীরে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে রক্তসংবহন প্রণালী'র কথা, তখন তাঁদের যাজকরা শায়েস্তা করতে চেয়েছেন। আর তার ফলে, মানুষের মধ্যে কিন্তু প্রশ্নের উদয় হয়েছে। যত শাস্তির বিধান নেমে আসবে, ততই মানুষ প্রশ্ন করতে উদ্যত হবেন। তাই ভয় পেও না, গেভান্নি।

... ...

গেভান্নি – স্যার ... আপনি পালান, স্যার। ফ্লোরেন্স ছেড়ে। ইতালি ছেড়ে।

ব্রুনো – কেন গেভান্নি? কী হয়েছে? তুমি এমন হাঁপাচ্ছ কেন?

গেভান্নি – আমি লাইসিয়াম কর্তৃপক্ষের সভার আলোচনা শুনতে পেয়েছি, স্যার। আপনার বিরুদ্ধে সেখানে সমালোচনা উঠেছে। আমার বাবাও সে আলোচনার অংশীদার। তাঁরা মনে করছেন, আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা বিদ্রোহী তৈরী হবে। আপনাকে ইনকুইজিশনের সামনে তোলা হবে, স্যার। এমনকি, এ খবর রোমের ক্যাথলিক চার্চেও পাঠানো হয়েছে। আপনাকে 'শয়তানের দূত' হিসাবে ইনকুইজিশনের সামনে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, স্যার।

৬

পোপ – ধর্মদ্রোহী ব্রুনোর জন্য সিসা দিয়ে কারাগার তৈরী কর, যা গ্রীষ্মে হয়ে উঠবে ভয়ংকর আর শীতে রক্ত জমানো ঠাণ্ডা। প্রভু যীশু ধর্মবিদ্বেষীর জন্য এই শাস্তিই বহাল করেছেন। তিনি দয়াময়। তিনি আসামী'কে আরও সময় দিতে চান। ব্রুনো তাঁর কথা ফিরিয়ে নিয়ে, ক্ষমা চাইলেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে।

বিশপ – প্রভু যীশু অশেষ দয়াময়। কিন্তু, কত সময় মহান পোপ? এ ধর্মদ্রোহী'কে কারাগারে নিক্ষেপ করলেও সে মানবে বলে মনে হয় না। সে ইতালি ছেড়ে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের অলিতে-গলিতে ঘুরে এতদিন তার ধর্মবিরোধী কথাবার্তা প্রচার করেছে। গোটা চারেক বইও লিখে ফেলেছে।

পোপ –হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, সিসার কারগার সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম মাতব্বরেরই হয়। দেখা যাক, এ ধর্মদ্রোহী'টি কতদিন টেঁকে।

বিশপ – এ'কে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, মহান পোপ। এসব রক্তবীজের বংশধরদের সমূলে উৎখাত করতে না পারলে গীর্জার প্রতি মানুষের বিশ্বাস রক্ষা করা যাবে না। দেখবেন, যেন এর এক ফোঁটা রক্তও পবিত্র ইতালির মাটিতে না পড়ে।

৭

পোপ – শয়তানের দূতকে হাজির কর। দীর্ঘ আট বছর কেটে গেছে, তবু ধর্মদ্রোহী'টা তার দোষ স্বীকার করে নি! গীর্জার কাছে ক্ষমাও চায় নি।

বিশপ – আমি তো বলেই ছিলাম, মহান পোপ। যে ওই অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে শীতের রাতে বরফের পাহাড় ভেঙে ফ্লোরেন্স থেকে সুইজারল্যান্ড যাত্রা করতে পারে, সে সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিভূ।

সকলে – ধরে নিয়ে এসো সেই 'শয়তানের দূত'কে! বাঁধো ওকে!! ইনকুইজিশনের সামনে হাজির কর!!!

পোপ – বল নাস্তিক, তোমার বক্তব্য কী? তুমি কি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস কর না?

ব্রুনো – যা পরীক্ষার দ্বারা, যুক্তির দ্বারা জ্ঞানের অধীনস্থ করা যায় না, তাকে আমি বিশ্বাস করি না।

পোপ – তুমি বলেছ, সূর্য স্থির, পৃথিবী ঘুরছে। আমরা তো সূর্যকেই ঘুরতে দেখি। তা দেখেও তুমি সেকথা বিশ্বাস কর না কেন?

ব্রুনো – কেবল দেখাটাই সবসময়ে সত্য নয়। তাহলে অদেখা সবকিছুকেই অসত্য বলে ধরে নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে তো ঈশ্বরকেই সবার আগে অসত্য বলে বর্জন করতে হয়।

পোপ – শাস্ত্রদ্রোহী!! তোমাকে যেটুকু জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সেটুকুরই জবাব দাও! তুমি কি ঈশ্বরের সৃষ্টি মহাবিশ্বকেও অস্বীকার কর?

ব্রুনো – এ মহাবিশ্ব স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত।

পোপ – তাহলে কি তুমি ধর্মীয় সত্যকে স্বীকার কর না?

ব্রুনো – সত্য একটি জটিল ধারণা। যে সত্যকে আমি জেনেছি, আগামীদিনের নতুন নতুন সত্যের আলোয় তারও রূপ

বদলাবে। শাশ্বত বলে কিছু ধরে রাখাটাই অসত্য।

পোপ – চুপ কর! এ তোমার শিক্ষালয় নয়! তুমি তাহলে পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে স্বীকার কর না?

ব্রুনো – মহাবিশ্ব অসীম ও অনন্ত। এর কোথায় কেন্দ্র, কোথায় প্রান্ত, এসব স্থির করা অসম্ভব। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। তার অর্থ এই নয়, এই সৌরপরিবারই মহাবিশ্বে একমাত্র, যা এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

পোপ – তাহলে তুমি মনে কর, এই সৌরপরিবার ছাড়াও আরও গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবার অবস্থান করছে?

ব্রুনো – অবশ্যই। আবার এই গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তা ছাড়া, সকল গ্রহ-নক্ষত্রেরই দুই প্রকার গতি রয়েছে। আবর্তন ও পরিক্রমন। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর অবস্থান আপেক্ষিক ও অন্য বস্তুর সাপেক্ষে নির্ধারিত।

পোপ – অপরাধী! বালসুলভ কথায় তুমি অত্যন্ত সুপটু দেখছি!! তুমি কি স্বয়ং যীশুকেও অস্বীকার কর? তাঁর জন্ম-মৃত্যুর রহস্যও কি তোমাকে অভিভূত করে না?

ব্রুনো – আমি মহান যীশুর কর্মেই তাঁর মহত্ত্ব খুঁজতে চেষ্টা করি। তাঁর জন্ম-মৃত্যুতে নয়। কোনো মানুষের পক্ষেই 'পবিত্র আত্মা'র প্রভাবে কুমারী মাতার গর্ভে জন্মানো সম্ভব নয়। এমনকি, মৃত্যুর পর ফিরে আসাও অসম্ভব।

পোপ – শয়তান !!! তুমি মহান যীশুকে 'মানুষ' বললে!!! এতদূর দুঃসাহস!!! তোমাকে ... তোমাকে ...

ব্রুনো – (হেসে) – জেন্টলম্যান, আমি তো দেখছি, আমি তোমাদের রায় শুনতে যত না ভয় পাচ্ছি, তোমরা রায় দিতে তার চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছ। সত্য কথায় তোমাদের এত ভয়!

পোপ – বাঁধো এই অপরাধীকে! ওর বিষাক্ত জিভ বেঁধে রাখো! ওকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারো!! মহান ঈশ্বরের এ-ই অভিপ্রায়। ওর এক ফোঁটা রক্তও যেন ঈশ্বর সৃষ্ট এই ধরাধামে না পড়ে! ওর নামটাও যেন পৃথিবী থেকে মুছে যায়!!

সকলে – মারো ... মারো ওই ধর্মদ্রোহীকে! পুড়িয়ে ফেল ওকে!! পুড়িয়ে ফেল ওর বই!! শেষ করে দাও!! ওর নামও যেন কেউ না জানে!!

৮

বিবেক – কেউ কি জানো, কারা ছিলেন সেদিনের বিচারক? কে সেই পোপ? তাঁর নাম কী? কে সেই বিশপ? সেই বিচারক জনমানসে হারিয়ে গেলেও, সেই বিচারপ্রাপ্ত অপরাধীর নাম চিরকাল জ্বলন্ত প্রদীপ হয়ে আলো দেখাবে। সে বহ্নিশিখা চিরদিন প্রজ্জ্বলতি হতে থাকবে মানুষের মনে।

এই চিরাচরিত আতঙ্ক আজও যুক্তিবাদী, সচেতন নাগরিককে তাড়া করে না কি? তার উত্তরসূরী বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংসকেও বলতে হয়েছিল, 'I don't fear God. I fear his believers.'

ব্রুনো হত্যার ঘটনায় কাতর শেলীর কবিতাটি মনে আছে?

I was an infant when my mother went
To see an atheist burned. She took me there.
The dark-robed priests were met around the pile,
The multitude was gazing silently;
And as the culprit passed with dauntless mien,
Tempered disdain in his unfaltering eye,
Mixed with a quiet smile, shone calmly forth;
The thirsty fire crept round his manly limbs;
His resolute eyes were scorched to blindness soon;
His death-pang rent my heart; the insensate mob
Uttered a cry of triumph, and I wept,
Weep not child, cried my mother, for that man
Has said, There is no God." ■

সমীক্ষা ঃ

সুন্দরবনের গ্রামে কৃষকদের মধ্যে অনুসন্ধান

[সম্প্রতি সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের পাথরপ্রতিমা ও রাক্ষসখালি অঞ্চলের গোবিন্দপুর এলাকায় কৃষকদের মধ্যে আমাদের কর্মীরা সমীক্ষা করেন। পাঠকদের অবগতির জন্য এই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

পাথরপ্রতিমা অঞ্চল ঃ এই অঞ্চলে যে কৃষকদের মধ্যে আমরা গেছি, তারা সে অর্থে কেউ বড় চাষী নয়, ছোট ও মাঝারি চাষী। এরা মূলত ধান চাষ করেন এবং নানা সবজী চাষ করেন।

সমীক্ষায় কৃষকদের কাছ থেকে যে তথ্য উঠে এসেছে তা হল –

১. কৃষকরা চাষ করে যে ফসল ফলান তা পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাকি অংশ বাজারে বিক্রি করেন।

২. কৃষিকাজ অধিকাংশ পরিবারের প্রধান জীবিকা নয়, অল্পবয়সীরা অধিকাংশই জেলা, রাজ্য এমনকি দেশের বাইরে শ্রমদান করেন। অপর অংশ স্বনিযুক্তি প্রকল্প বা ব্যবসায় নিযুক্ত। বয়স্কদের একটা অংশ কৃষিকাজ করেন।

৩. চাষ করার জন্য মাটির গুণাগুণ জেনে সার-বীজ-কীটনাশক ব্যবহার করার জন্য মাটি পরীক্ষা কেউ করান না। অধিকাংশ কৃষকের আবার মাটি পরীক্ষার বিষয় জানাও নেই।

৪. কৃষকরা চাষবাসের জন্য অজৈব কৃত্রিম সারই বেশি ব্যবহার করেন যাকে তারা রাসায়নিক সার বলেন। প্রচার শুনে কৃষকদের ধারণা কৃত্রিম সার মাটির ক্ষতি করে, জৈব সারে ভালো কাজ হয়। যখন তাদের প্রশ্ন করা হয় যে তবে কৃত্রিম সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করেন না কেন? কয়েকবার ব্যবহার করে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা বলেন 'জৈব সারে ভালো কাজ হয় কিন্তু পরিমাণে অনেক বেশি দিতে হয় বলে খরচ অনেক বেশি।'

৫. ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি সম্পর্কে কৃষকদের কোন ধারণা নেই। সমস্ত ফসল সরকারকে ন্যায্যমূল্যে কিনতে হবে এমন দাবিও তাদের নেই। এর কারণ বাজারজাত করা ফসলের পরিমাণ অল্প।

৬. সার, বিষ, যন্ত্রপাতি, ডিজেল ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষোভ আছে।

৭. ফসলের বিক্রয়মূল্য স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুসারে C_2+50% হওয়া উচিৎ জানানো হলে তারা এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলেন।

৮. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত কৃষিকাজের সম্পর্কে জানানো হলে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষরা আগ্রহ দেখান, যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে তা সম্ভব নয় এটাও তাদের উপলব্ধি।

গোবিন্দপুর অঞ্চল ঃ গোবিন্দপুর আবাদ অঞ্চলে আমরা অনুসন্ধানে গিয়েছিলাম, চাষবাসের অবস্থা জানার জন্য। এই অঞ্চলে মোট তিনবার যাওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন পাড়াতে।

সব জায়গায় প্রায় একই বক্তব্য উঠে এসেছে। সবার কাছে একটা সাধারণ সমস্যা – বন্যা। প্রায় সময় নদীবাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে যাওয়ার ফলে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও সার-বিষ-এর দাম ক্রমাগত বাড়ছে এবং মাটি পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে তারা বুঝতেও পারেন না যে কোন্ সার কতটা প্রয়োজন। তাই অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সারও দিয়ে দেন। সঠিক ধারণা না থাকার ফলে অনেক চাষী মনে করেন যে, জৈব সার বেশি ভালো, অজৈব সারের থেকে। কিন্তু ভালো ফসল পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র জৈব সারের উপর নির্ভরও করতে পারেন না। অজৈব সারও দিতে হয়। একজন চাষী যিনি জমি লিজে নিয়ে চাষ করেন, তিনি বললেন, "অন্যের জমি নিয়ে চাষ করি এক বা দুই বছরের জন্য। আমি তো চাইবোই যাতে আমার লাভ হয়। তাই বেশি বেশি সার দিতে হয়। তা সত্ত্বেও অনেক সময় খরচের টাকাটাও উঠে আসে না। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। ফসল নষ্ট হলে সরকারী ক্ষতিপূরণও পাই না কারণ জমি অন্যের। চাষ-বাস ছাড়া অন্য কিছু ভালোভাবে পারি না, তাই এটাই করে যাচ্ছি।"

এছাড়াও মাটি পরীক্ষার বিষয়টিও খুব বড় সমস্যা। এখানে সরকারীভাবে মাটি পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। যেখানে আছে, সেখানে গিয়েও সঠিক সময়ে কাজ হয় না। নমুনা দিয়ে আসার এক মাস পরেও ফলাফল জানা যায় না। যাতায়াতের খরচও অনেক। তাই চাষীরা হতাশ হয়ে গিয়ে আর যান না। অনেকে তো জানেও না কোথায় পরীক্ষা হয়।

আবার চাষের জন্য শ্রমিকও নিয়োগ করতে হয়, কারণ শুধুমাত্র নিজেদের শ্রম দিয়ে হয় না। অনেককে চাষের জন্য জলও কিনতে হয়। এক-দু'জন চাষী যাদের অনেক জমি আছে, তারা অনেক খরচ করে নিজেরা স্যালো, টিউবওয়েল বসিয়েছেন। অর্থাৎ, বীজ থেকে শুরু করে মাটি চষা, জল, শ্রমিক, সার-বিষ ইত্যাদি খরচ করিয়ে একজন চাষীকে ফসল ফলাতে হয়। কিন্তু যখন সে সেই ফসল নিয়ে বাজারে যান, তখন ন্যায্য দাম পান না। এবং কোল্ড স্টোরেজ-এরও কোন ব্যবস্থা না থাকায় চাষী বাধ্য হয় তার ফসল কম দাম হলেও বিক্রি করতে। বিশেষ করে কাঁচা ফসল যেমন – সব্জী, পান ইত্যাদি। আবার ধানও স্টোরেজ-এর অভাবে খুব বেশিদিন রাখতে পারেন না। ফঁড়েদের কাছে বিক্রি করে দেন। স্থানীয় এলাকায় কোন সরকারী মান্ডিও নেই। সরকারী মান্ডি এত দূরে যে, সেখানে যাওয়ার খরচও পোষায় না।

এইসব কারণে এলাকার যুবকেরা চাষের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন। তারা মাইগ্রেট করছেন কাজের খোঁজে অন্যান্য রাজ্যে বা দেশের বাইরে। যেসব বয়স্ক লোকেরা এখনও চাষের সঙ্গে যুক্ত, তাদের বক্তব্য হল – "বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে চাষ করে আসছি, এখন আর নতুন করে কি করবো। আর তো কিছু ভালোভাবে পারিও না। জমিটা কি পতিত পড়ে থাকবে? তাই চাষ করি। নিজের গতরটা তো আছে। যদ্দিন পারি, করবো।" ■

সংগঠন সংবাদ

বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৩-এর ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আমাদের সংগঠন বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বইমেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। শুরু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর বইমেলা, উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি বইমেলা, পুরুলিয়া জেলা বইমেলা, পুরুলিয়ার লিটিল ম্যাগাজিন মেলা থেকে সোনারপুর বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক'র পরিচালনায় অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠনের সহযোগিতায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল, টেলিস্কোপের সাথে আকাশ পর্যবেক্ষণ, সাপের ওপর মডেল প্রদর্শন ইত্যাদি ১০ দিন ব্যাপী প্রদর্শন চলে যা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। এরপর একে একে বেহালায় সখের বাজার এলাকায় ও চৌরাস্তায় বইমেলা, কলকাতার কলেজ-স্ট্রীট বইমেলা, দুর্গাপুর বইমেলা, আসানসোল বইমেলায় আমরা আমাদের 'সমীক্ষণ' ও 'ইনসাইট' নিয়ে স্টল দিয়েছিলাম। পুরানো ও নতুন পাঠকদের কাছে আমাদের মুখপত্র পৌঁছে দেবার একটা প্রয়াস নিয়েছিলাম। বইমেলাগুলিতে প্রচুর উৎসাহী পাঠকরা আমাদের মুখপত্র সংগ্রহ করেছেন। ■

সুভাষ চন্দ্র বসু – নেতাজী স্মরণে

গত ২৩শে জানুয়ারী ২০২৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মন্দিরতলা ব্লকের অন্তর্গত তাজপুর গ্রামে নেতাজী জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বিজ্ঞান মনস্ক'র উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর কবি শুভ্রা ঘোষের 'প্রি নেতাজী' কবিতার ওপর নৃত্য হয়। এছাড়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কবিতা আবৃত্তি করে। তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে নেতাজীর জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখে। বিজ্ঞান মনস্ক'র তরফে নেতাজীর জীবন ও আদর্শ এবং তার অসমাপ্ত কার্যকলাপের প্রতি দায়িত্বশীল দেশবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা কিছু নাচ-গানের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের দুরবস্থা, যুদ্ধ বিরোধিতা ও অনর্জিত স্বাধীনতায় শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের কর্তব্য ও আকাঙ্খার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বিকালেও নাচ-গান পরিবেশনা করা হয়। একটি একক নাটক উপস্থাপনা করা হয়। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা হয়। এই সমগ্র অনুষ্ঠানের মঞ্চ প্রস্তুত থেকে শুরু করে সাউন্ড সিস্টেমের সমস্ত দায়িত্ব গ্রামবাসীরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে করে এবং আগামী দিনেও এই ধরনের অনুষ্ঠান্তে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। ■

জিওর্দানো ব্রুনো – বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী

বিজ্ঞানের প্রথম শহীদ জিওর্দানো ব্রুনোর স্মরণে বেহালা-ঠাকুরপুকুর ইউনিটের তরফ থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সংগঠনের তিনজন বক্তা 'জিওর্দানো ব্রুনো – বর্তমান সময় ও আগামী পৃথিবী' শীর্ষকে বক্তব্য রাখে। এই সংখ্যায় বক্তব্যের সেই বিষয়বস্তু প্রকাশিত হচ্ছে। এরপর উপস্থিত দর্শকরাও বক্তব্য দেন। সঞ্চালকের সুদক্ষ সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সজীব হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মান খুবই উন্নত ছিল। 'বলো ভুলতে কি পারি, সাথীদের খুনে রাঙা পথ' – গান অত্যন্ত মনোরম ছিল। সবশেষে ব্রুনোর জীবন নিয়ে একটি শ্রুতি নাটক 'বহ্নিশিখা' মঞ্চস্ত হয়। সাতজন ছাত্র-ছাত্রী খুবই দক্ষতার সঙ্গে এই নাটকটি উপস্থাপনা করে, যা উপস্থিত সকল দর্শককে আবেগ তাড়িত করে তোলে। ■

স্কুলে স্কুলে পত্রিকা হকিং

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে পত্রিকা হকিং-এর মাধ্যমে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সমীক্ষণ পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়। ■

চিঠিপত্র ঃ

স্পীডপোস্ট, কে জানে কবে আসবে? আজ ২৬/০১/২০২৪-এ যখন কলিং বেল বেজে উঠলো, নীলু গিয়ে দরজা খুলে এসে বললো – 'তোমার শাড়ি এসেছে', ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে গেল। তারপর যখন মেয়ে খাম খুলে বললো – 'মা বইগুলো এসেছে', সেই কবে পোস্ট ম্যান চিঠিপত্র দিতে আসতো, সে সব ভুলতে বসেছি। অবশেষে বিজ্ঞান মনস্ক-র 'সমীক্ষণ' সাথে ক্রোড়পত্র 'আহ্বান'। এতো শাড়ি, মহরত, সোনা, হীরা, মণিমাণিক্যের চেয়ে ঢের বেশি দামী, ওইসব তো ক্ষণিকের জন্য। তারপর আবার দীর্ঘস্থায়ী নয়। এ যে জীবন খুঁজে পাওয়া, প্রথমে আমার সাথীদের ধন্যবাদ জানাই।

উষালগ্ন থেকে তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপরে আঘাত হানা চলছে। আজও তো ভুলিনি। সমাজ বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত সকল বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন। আমার দেশের গবেষণা, যা আজও চলছে চলবে। যদিও মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার, অলৌকিকতাবাদ, ধর্মবাদকে বর্ম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল চলছে। চলবে নাই বা কেন? অসহায়, অর্ধ-নিরক্ষর, বেরোজগারী, অভুক্ত মানুষের কাছে টাকা পয়সা নেই। তাদের কাছে তো ঝাড়ফুঁক, গুনীন, ওঝাদের রমরমা কারবার চলছে। আর দেশের সরকার এটা জিইয়ে রাখতে চায়, যাতে মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জীত থাকে। বিজ্ঞান মানুষের চোখ খুলে দিতে তো আসবেই। জয় সুনিশ্চিত। ■

সুপ্রিয়া মাজি
নিউ টাউন

বিজ্ঞানের খবর

অক্টোবর, ২০২৩

১.●অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক মহাবিশ্বকে সহজবোদ্ধভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমেরিকান জার্নাল অব ফিজিক্স-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্বের জন্ম হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে সময়ের সাথে মহাবিশ্বের পরিবর্তনকে দুইটি সহজ লেখচিত্রের প্লটের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বুঝিয়েছেন। একটি প্লটে মহাবিশ্বের প্রসারণ ও শীতলীকরণের সাথে সাথে তার তাপমাত্রা ও ঘনত্ব কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। অন্যটিতে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর আকার ও ভরের কিভাবে পরিবর্তন ঘটেছে তা ফুটিয়ে তোলা হযেছে। (আমেরিকান জার্নাল অব ফিজিক্স)

২.● হাঙ্গেরিয়ান-আমেরিকান জীববিজ্ঞানী ক্যাটালীন ক্যারিকো ও আমেরিকান ইমিউনোলজিস্ট ড্রীউ ওয়েসম্যানকে যুগ্মভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। কোভিড মহামারিকালে mRNA ভ্যাকসিন তৈরীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য এই পুরস্কার অর্জন করেছেন ঐ বিজ্ঞানীদ্বয়। (বিবিসি নিউজ)

৩.●ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের আগোস্তিনি, হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী ফেরেন্স ক্রাউজ ও ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যান লিয়ের যুগ্মভাবে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। এই তিন বিজ্ঞানী আলোর অ্যাটোসেকেন্ড (১ সেকেন্ড = $১০^{১৮}$ অ্যাটোসেকেন্ড) স্পন্দন তৈরীর পরীক্ষালব্ধ প্রক্রিয়া নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা পরমাণুর ভিতরে প্রচন্ড বেগে ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রন কণার গতিবিধি আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৪.●২০২৩ খ্রিস্টাব্দের রসায়ন শাস্ত্রে যুগ্মভাবে নোবেল পুরষ্কার অর্জন করলেন তিন জন বিজ্ঞানী। এনারা হলেন, মুঙ্গি বাওয়েন্ডি (ফ্রান্স), লুই ব্রুস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ও আলেক্সি ইয়াকিমভ (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন)। কোয়ান্টাম ডটস আবিষ্কার ও সংশ্লেষ করার জন্য তাঁদের এই পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। এই আবিষ্কার সেমিকন্ডাক্টর তথা ন্যানো টেকনোলজির নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৫.●২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক অঞ্চলের বিস্তৃত উষর মৃত্তিকাভূমি থেকে প্রাপ্ত পদচিহ্ন পরীক্ষা করে জানা গেছে তা মানুষের। যার আনুমানিক বয়স ২১ থেকে ২৩ হাজার বছর। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন উত্তর আমেরিকার ঐ অঞ্চলে মানুষের আগমন ঘটেছিল ঐ সময়ে। যদিও এই বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে রয়েছে নানান বিতর্ক। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১০.●এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা মুরগীর শরীরে জিন-পরিবর্তন ঘটিয়ে বার্ড ফ্লু সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। (বিবিসি নিউজ)

১১.●মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা প্রেরিত 'ওসিরিস-রেক্স' নামক মহাকাশযান, '১০১৯৫৫ বেণু' নামক একটি গ্রহাণু থেকে নমুনা সংগ্রহ করে সফলভাবে পৃথিবীতে অবতরণ করল। (নাসা)

১২.●একটি সমীক্ষায় জানা গেছে নিকটতম কক্ষগুলিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দশ হাজার। কেবলমাত্র ষ্টারলিঙ্ক সংস্থারই ৪৫০০টি উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর বহু দেশ এখন কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে। অনেক ক্ষেত্রে, উপগ্রহপুঞ্জ পাঠানো হয় যেগুলি একসাথে কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, উপগ্রহের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে অচিরেই এর সংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছাবে। ফলে পৃথিবীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, মহাকাশে দুর্ঘটনা ঘটে যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রিপোর্টে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনস্থ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নকে অতি সত্তর এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। (সায়েন্স)

১৩.●মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিশেষজ্ঞ পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে রচিত একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে, কোভিড-১৯ প্রতিষেধকের তিনটি ডোজ রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ৬৯% কার্যকরী, যেখানে দুটি ডোজ ৩৭% কার্যকারীতা প্রদান করতে সক্ষম। এই কার্যকারীতা লং-কোভিডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৯.●মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তারা 'এফআরবি ২০২২০৬১০এ নামক একটি দ্রুত রেডিও বিস্ফোরণ এর সংকেতের সন্ধান পেয়েছেন যা পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল ৮০০ কোটি বছর। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে এটি একটি অতি-দ্রুত রেডিও বিস্ফোরণ যার স্থায়িত্ব এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ থেকে তিন সেকেন্ড পর্যন্ত। বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে রেডিও বিস্ফোরণের ঘটনা জানতে

পারেন কিন্তু এর উদ্ভব কিভাবে হয় সেই ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। (নেচার অ্যাস্ট্রোনমি)

২৫.●মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' প্রেরিত ল্যান্ডার ইনসাইট মঙ্গল গ্রহের মাটি স্পর্শ করে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। সিসমিক তরঙ্গের সাহায্যে গ্রহের ভূকম্পন, ভূমিতি ও তাপ পরিবহন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে এই স্বয়ংচালিত যানটি পাঠানো হয়। সম্প্রতি যানটি মঙ্গলের ভূত্বকের নীচে তেজস্ক্রিয় লাভার সমুদ্রের সন্ধান পেয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (নাসা)

২৬.●সম্প্রতি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন শুক্রগ্রহে প্লেট সঞ্চালনের অস্তিত্ব আছে বলে অনুমান করেছেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে এই কারণেই ঐ গ্রহ প্রাণের উদ্ভব ও প্রাণ ধারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। (নাসা)

নভেম্বর ঃ

১.●পৃথিবী জুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রমরমা। জীবনের হেন কোন ক্ষেত্র নেই যে সেখানে এর প্রয়োগ নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপদ ও এর নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে বৃটেন সংঘটিত করল বিশ্বের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সামিট। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক, তিনি বলেন, সমাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যত সমস্যা কি হতে পারে তা সঠিকভাবে নির্ণয় না করে এর প্রতিকার খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি আরও বলেন, এই সামিট কোন নীতি নির্ধারণের কোন সূত্র দিতে পারবে না বলে তিনি মনে করেন। (বিবিসি নিউজ)

৫.●একটি চীনা সংস্থা 'লঙ্গি' জানিয়েছে যে তারা ৩৩.৯% কার্যক্ষমতা বিশিষ্ট সিলিকন পেরভস্কাইট সৌর কোষ বানাতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের অগাস্টে ঐ কোষের কার্যক্ষমতা ছিল ২৩.৬%। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ক্ষমতা গাণিতিক হিসাবকেও ছাড়িয়ে গেছে। (দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট)

●নিউ ইয়র্ক-এর একদল শল্য চিকিৎসক সম্প্রতি ৪৬ বছর বয়স্ক এক যুবকের পূর্ণ-চক্ষু প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। সংস্থাপনের পরবর্তীতে চোখের স্বাস্থ্য যথা রক্ত পরিবহন, রেটিনার কার্যকারীতা ইত্যাদি স্বাভাবিক হলেও দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে চিকিৎসকেরা ব্যর্থ হয়েছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন এই ধরনের অস্ত্রোপচার মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম, তবে দৃষ্টিশক্তি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে গবেষণা চলতে থাকবে যা আগামীদিনে অবশ্যই সাফল্য এনে দেবে। (রয়টারস)

১৬.●শিকল-সেল-অ্যানিমিয়া, ও বিটা থ্যালাসেমিয়া-র মতো জিন-এর ত্রুটিগত রোগের চিকিৎসার জন্য জিন থেরাপীকে অনুমোদন দিল বৃটেন। বৃটেনের চিকিৎসা নিয়ন্ত্রক সংস্থার তরফ থেকে CRISPR প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ দুই রোগ চিকিৎসার অনুমোদন দিয়ে জানানো হয় যে বৃটেনে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ জিন ঘটিত অ্যানিমিয়ার শিকার ও প্রতি বছর প্রায় ৩০০ শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তে এই সকল মানুষ উপকৃত হবেন। (বিবিসি নিউজ)

●বিজ্ঞানীরা আফ্রিকায় 'বোনোবস' নামক এক বানর জাতীয় প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন যারা দলীয়ভাবে অন্য দলের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করতে সক্ষম। গবেষকেরা জানিয়েছেন এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল কেবল মানুষের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বর্তমানে ঐ প্রজাতিও এই বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২২.●সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা একপ্রকার খননযন্ত্র বানিয়েছেন যা নির্মাণস্থলে ত্রিমাত্রিক মানচিত্র বানাতে সক্ষম। ঐ যন্ত্রে স্থাপিত সেন্সরের সাহায্যে নির্মাণস্থল খননে প্রাপ্ত প্রস্তর খন্ড ও ব্লকের আকার-আয়তন নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, নির্মাণ প্রযুক্তির প্রয়োগ আরও সহজ হবে ও শ্রমলাঘব ঘটবে। (সায়েন্স রোবটিকস)

২৬.●বৃহদাকার নক্ষত্র যখন জ্বালানীর অভাবে নিভে যায় ও সঙ্কুচিত হয়ে ভর, সময় ও আলো গিলে ফেলে, তখন কৃষ্ণগহ্বরের জন্ম হয়। এতদিন কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টির কারণ সাধারণভাবে এটাই জানা ছিল বিজ্ঞানীদের। সম্প্রতি মহাকাশ গবেষণায় কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টির অন্য একটি কারণ জানা গেছে। চন্দ্রা এক্স-রে অবজারভেটরী ও জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত চিত্র ও তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। অতি প্রাচীন একটি কৃষ্ণগহ্বর ছায়াপথের অস্তিত্ব আবিষ্কার থেকে এই ধারণার সূত্রপাত। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৯.●ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ বিজ্ঞানী অ্যানা ম্যাক্লুয়েড আকাশগঙ্গা ছায়াপথের প্রতিবেশী লার্জ ম্যাগেলিয়ান ক্লাউড নামক ছায়াপথে একটি চাকতিওয়ালা গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। আকাশগঙ্গার বাইরে এমন ঘটনা এই প্রথম। চিলির আলাকামা মানমন্দির থেকে দৃষ্ট এই ছায়াপথের দূরত্ব প্রায় ১৬০ হাজার আলোকবর্ষ। (ইএসও)

ডিসেম্বর ঃ

৬.●ভূবিজ্ঞানীরা দক্ষিণ আমেরিকার পুনা ডি আটাকামা-র বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গবেষণা চালিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে ঐ অঞ্চলের সাথে আদিম পৃথিবীর বহু সাদৃশ্য রয়েছে। সমুদ্রস্তর থেকে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত ঐ মালভূমি হল পৃথিবীর শুষ্কতম অঞ্চল। হ্রদগুলিতে পাওয়া গেছে প্রাচীন বাস্তুতন্ত্রের সন্ধান। হ্রদগুলির তলদেশে পাওয়া গেছে বিস্তর স্ট্রোমাটোলাইট যা

সম্ভবত আর্কিয়ান যুগের চিহ্ন বহন করে যাচ্ছে যখন পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ছিলনা অক্সিজেন। তাই বিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলকে আদিম পৃথিবীকে দেখার জানালা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। (কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়)

৭.●গত এক দশকে কণা পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আগামী দশকে এর গবেষণা কোন অভিমুখে এগিয়ে যাবে এই বিষয়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। এতে বলা হয়েছে, গত দশকে কণা পদার্থ বিজ্ঞান প্রধানত চালিত হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল দ্বারা। এর মধ্যে হিগস বোসন কণা সহ অন্যান্য মৌলিক কণার আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তবে, ঐ কণা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়নি। মাধ্যাকর্ষণ, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি, কৃষ্ণ গহ্বর, নিউট্রিনো, মহাবিশ্ব প্রসারিত হবার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি ঘটেনি। তাই প্রয়োজন একটি সঠিক রোড ম্যাপ যা আগামী গবেষণার দিশা নির্দেশ করবে। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৩.●মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা প্রেরিত মহাকাশযান ওসিরিস-রেক্স, 'বেণু' নামক গ্রহাণু থেকে সংগ্রহ করা নমুনার পরীক্ষা শুরু হয়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় নমুনায় উচ্চ কার্বন সমৃদ্ধ জৈব পদার্থের উপস্থিতি জানা গেছে। এছাড়া ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও ফসফরাসের মতো মৌলের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্যান্য পদার্থগুলির সনাক্তকরণ জারি আছে। (নাসা)

১৫.●গুগল ডীপমাইন্ড নামক এক সংস্থা দাবি করেছে যে তারা এআই চ্যাটবট সংক্রান্ত দশক পুরানো একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান সূত্র আবিষ্কার করেছে। এর ফলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রয়োগে গতি আসবে, যেখানে গাণিতিক উপায়ে প্রাপ্ত অপ্রয়োজনীয় সমাধানগুলিকে বর্জন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সমাধানগুলি গ্রহণ করা যাবে। (দ্য নেকস্ট ওয়েব)

২০.●আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যারয়ের একদল বিজ্ঞানী একগুচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছেন যা মেথিসিলিন প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়াকে (স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস) ধ্বংস করতে সক্ষম। জানা গেছে এই প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণে আমেরিকায় প্রতি বছর ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন উক্ত গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এই সাফল্য এসেছে। (এমআইটি)

●একটি পরীক্ষামূলক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভ্রান্ত খবরের সত্যতা মূল্যায়নের জন্য অনলাইন অনুসন্ধান, মিথ্যা সংবাদ নিবন্ধের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য সেই সমস্ত সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে যারা নিকৃষ্টমানের তথ্য প্রদান করে। এর থেকে মুক্তি পেতে গবেষকরা মিডিয়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নিদান দিয়েছেন। (নেচার)

২৯.●একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রেকর্ড সংখ্যক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবার পর প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ জার্নাল হিন্দাই নামক এক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত। প্রত্যাহৃত জার্নালের অধিকাংশই সৌদি আরব, রাশিয়া, পাকিস্তান ও চীন থেকে প্রকাশিত বলে জানানো হয়েছে। প্রত্যাহৃত হবার কারণ হিসাবে জানা গেছে, ভুল, অনির্ভরযোগ্য, অপ্রচলিত তথ্য ইত্যাদি। (নেচার)

জানুয়ারী, ২০২৪

৩.●ইলেকট্রনিক্স-এর দুনিয়ায় বহুল ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর বলতে মূলতঃ সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর-কেই বোঝায়। সম্প্রতি জর্জিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা কার্বনের এক রূপভেদ গ্রাফিনকে কার্যকরী সেমিকন্ডাক্টরে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে গ্রাফিন সিলিকনের তুলনায় উচ্চমানের সেমিকন্ডাক্টর যা অনেক বেশি পরিমাণ তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম ও দীর্ঘ ব্যবহারে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় না। (ইউরেক অ্যালার্ট)

●সদ্যজাত ছায়াপথের আকৃতি কেমন? এতদিন মহাকাশ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল সদ্যজাত ছায়াপথের আকার ও আকৃতি আজকের মহাবিশ্বের মতো গোলাকার। কিন্তু ইদানীং জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ প্রেরিত প্রায় ৪ হাজার সদ্যজাত ছায়াপথের ছবি এই ধারণা বদলে দিয়েছে। ছবিতে দেখা গেছে জন্মকালে ছায়াপথগুলির আকৃতি কলার মতো। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৯.●স্পেনের বার্সিলোনায় অবস্থিত 'আইসিএফও'-র একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি পদার্থের একটি নতুন দশা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই দশার নাম দেওয়া হয়েছে 'আলোক-বস্তু-সংকর' (লাইট-ম্যাটার হাইব্রীড) – দশা। পদার্থ ও আলো-র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে বস্তুর এই দশা প্রাপ্ত হয়। বস্তুর এই দশাপাপ্তি ও এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধীয় বহু জিজ্ঞাসার উত্তর এখনও অজানা। (ই ই ই স্পেক্ট্রাম)

১০.●পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব শুরু হয় এককোষী প্রাণীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। আর এই কোষ গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল দীর্ঘ শৃঙ্খল যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি একদিকে জলাকর্ষী ও অন্যদিকে জলবিকর্ষী এই দুই বিপরীত ধর্ম থাকার কারণে এগুলি হল কোষপর্দার প্রধান

●*শেষাংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

‘বৃক্ষরোপণ জলবায়ু সমস্যার সর্বরোগহর দাওয়াই!’

বিষয় প্রবেশ

লোকাল ট্রেন। স্টেশন ছাড়তেই মন্দ্র কণ্ঠে শুনতে পেলেন ‘এই যে দাদারা, দিদিরা – ঘুম থেকে উঠলেই করে গলা বুক জ্বালা, ক্ষুধামান্দ্য, খেলে আবার চোঁয়া ঢেকুর, বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নে যেতে ভয় করে – কত খেয়েছেন অ্যালোপ্যাথী-স্যানটাক-ম্যানটাক, ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া – কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একটি বার সেবন করুন আমার এই দেশজ-ভেষজ গাছ গাছড়া থেকে প্রস্তুত বটিকা। মনে রাখবেন গাছ কখনো মিথ্যা বলে না। ছেলে-মেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কিন্তু গাছ পারে না ...

পাঠকের স্থূল মনে হতে পারে কিন্তু মাল বিক্রি করার জন্য সম্ভাব্য খরিদ্দারের অসহায়তার সাথে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে গাছের প্রতি বিশ্বাসহীনতার অভিযোগ। ফলাফলটা বিক্রেতারা বলে দেবেন।

এবার একটা ‘পরিশীলিত’ নমুনা পেশ করা যাক। শ্রীমতি ও শ্রী বিশ্বাস বিয়ে বাড়ির রিসেপশনে ছক্কা হাঁকিয়ে দিলেন। নতুন বর-বউয়ের জন্য উপহার নিয়ে গেলেন ডিজাইনার টবে শোভিত দুটো ফনফনে চারা গাছ। ‘সো কিউট’, ‘সো ইনোভেটিভ’, ‘ভাবা যায়’ এইসব প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়ার সাথে আক্ষেপ, পরিতাপ, বেদনা যুক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়ালো।

প্রয়োগ ভিন্ন হলেও বার্তা স্পষ্ট – গাছ দিয়ে বাজিমাত!

যে কারণে গত অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবন্ধ লিখে চলেছেন **‘একটি গাছ একটি প্রাণ’** অথবা **‘বনসৃজন ঃ পবিত্র কর্তব্য’** এবং উপরোক্ত ঘটনা সমূহ – একটা ধারণা (পারসেপশন) জনসমষ্ঠির মধ্যে চারিয়ে দেয় গাছ বা অরণ্যকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বা অবিচার করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীরা ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তাই তাদের খোঁজ করতেই হবে গ্যাসান্তক বটিকা অথবা ডিজাইনার চারাগাছের ভবিষ্যৎ ফল কী হল। ঠিক তেমনি গাছ ও অরণ্যের প্রতি মানুষ কি স্বভাবগত ভাবে বৈরিতা পোষণ করে? সেজন্যই কি গাছ ও অরণ্য রক্ষার বাণী বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে? কি যুক্তিতে তাকে বর্তমান প্রেক্ষিতে রক্ষা করার ও বিকশিত করার অভিযান চালানো হচ্ছে? এ সবের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা বিজ্ঞানকর্মীদের অবশ্য কর্তব্য।

মানুষ এবং গাছ

আগে থেকে কোন ধারণা পোষণ না করে যদি আমরা চারদিকে নজর দিই তাহলে দেখবো শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির বারান্দায়-সিঁড়িতে-ছাদে মানুষে গাছ লাগান। খালপাড়ে বা রেল লাইনের ধারে গরীবের বস্তিগুলোও গাছ বিবর্জিত নয়। শহর ছাড়িয়ে সড়ক বা রেল পথে কৃষি এলাকায় এসে পড়লে দেখা যায় বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে যেখানটা গাছ দিয়ে ঢাকা সেটাই মানুষের আবাসস্থল। আর প্রাকৃতিক অরণ্যভূমিতে যে মানুষরা থাকেন তাঁরা ফল-পাতা-শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করেন বৈকি। গাছ ও অরণ্য তাদের জীবিকার উৎস। তাই সাধারণ মানুষ – একক বা দলবদ্ধভাবে গাছপালা কেটে ফেলছেন এমনটাও বর্তমানে অবসম্ভব। তাহলে কি গাছ কাটা হয় না? অরণ্য ভূমিতে হাত পড়ে না? – নিশ্চয়ই হয়।

বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মত অরণ্যের উপর অধিকার হল রাষ্ট্রের। নগর-বন্দর-সড়ক-শিল্প-শক্তিকেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য এবং বৃক্ষকে ‘টিম্বার’ (পণ্য রূপে ব্যবহৃত কাঠ) হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বৈধ ও অবৈধ উপায়ে জঙ্গল কাটা হয়। সাধারণ মানুষ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন না এটা বলা যাবে না। তবে তার প্রায় পুরোটাই শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে জীবিকা অর্জনের তাগিদে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী তাঁরা হন না। অথচ ‘গাছের গুরুত্ব বুঝুন’ – এই বাণীর লক্ষ্য হল ব্যাপক সাধারণ জনগণ। বিজ্ঞানকর্মীরা যদি এই অন্তর্বিরোধ ও বিভাজনরেখাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে না করেন তবে বৃহৎ বৃক্ষছেদন প্রকল্পে যারা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী তাদের সুরে-তালে প্রপাগান্ডা করা ছাড়া আর কোন কর্তব্য থাকে না।

গাছ এবং প্রকৃতি

প্রকৃতি আর প্রাকৃতিক পরিবেশ বললেই বেশিরভাগের চোখে বিরাট বৃক্ষরাজি শোভিত অরণ্যভূমির ছবি ভেসে ওঠে। এই ছবিটা সত্যের একটা অংশ মাত্র। প্রথমতঃ পৃথিবী সৃষ্টির

বহু বহু পরে প্রাণের উৎপত্তি। আর প্রাণের উদ্ভবের বহু বহু পরে এসেছে ঐ সমস্ত বিরাট বৃক্ষরাজি। দ্বিতীয়তঃ উত্তর মেরু অঞ্চলের বৃক্ষশূন্য বরফাবৃত প্রান্তর বা তুন্দ্রা অঞ্চল, ভারতের থর বা আফ্রিকার সাহারার মত উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি, লাদাখের মত শীতল মরু বা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বৃক্ষ বিরল, ঝোপঝাড় যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের সাভানা তৃণভূমিকে ঐ প্রকৃতির ছবিটাতে স্থান না দিলে আংশিক প্রকৃতিটাও বিকৃতরূপে ধরা দেবে। তৃতীয়তঃ গাছের ছবিতে কেবল বিরাট আচ্ছাদন (ক্যানোপি) যুক্ত মহীরূহ দের রাখলে হবে না, ঝোপ ঝাড়, গুল্ম, লতা, তৃণ এবং মিষ্টি ও নোনা জলের অনুবীক্ষণিক ফাইটোপ্লাংক্টনদের জায়গা দিতে হবে।

মহাবিশ্বের প্রতিটি উপাদান এবং বস্তুসমূহ সদা পরিবর্তনশীল, প্রকৃতি এবং উদ্ভিদ জগৎও তাই। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসগুলির অনুপাতিক হারও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব তথা প্রকৃতি জগতে এক গতিশীল সাম্যাবস্থা (dynamic equilibrium) বিরাজ করে। অতএব সামগ্রিকতাকে বাদ দিয়ে অংশের বিচার বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কোন রাস্তা খুলে দেয় না।

বৃক্ষরোপণ, অরণ্যসৃজন – বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

পৃথিবীর ভূভাগের পুরোটাই মানুষের সভ্যতা বিস্তারের আগে বৃহৎ বৃক্ষরাজি শোভিত অরণ্যভূমি ছিল না, এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শহর ও নগরের বিস্তার, কৃষিজমি ও গোচারণভূমির বিস্তার এবং আধুনিক সভ্যতার উপাদানগুলি সংগ্রহ ও তার ব্যবহারের জন্য অরণ্যভূমি কমেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু যা কিছু কমেছে বা হারিয়ে গেছে তাকেই কি আবার নির্মাণ ও সৃজন করার জন্য আমরা বিশ্বজোড়া অভিযান চালাই? যেমন আগেকার তালপাতার পুঁথি ও খাগের কলম, আগেকার রাজা রানী, গরুর গাড়ি, ঘোড়ায় টানা রথ ইত্যাদি ইত্যাদি – এ সব ফিরিয়ে আনার জন্য অভিযান চলে না। কিন্তু অরণ্য ফিরিয়ে আনার বা বাড়ানোর জন্য অভিযান চালাতে হচ্ছে কেন?

সংক্ষেপে কারণ হল **বিশ্ব উষ্ণায়ন**। হাল আমলে এর বদলে **'জলবায়ু পরিবর্তন'** – এই পরিভাষাকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর মানব সমাজের ক্রিয়াকলাপে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে পড়ছে অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের ফলে। জলীয় বাষ্প ছাড়া গ্রীন হাউস গ্যাস মুখ্যত

➔

●*বিজ্ঞানের খবর*

উপাদান। কিন্তু প্রকৃতিতে কিভাবে এই ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষিত হল তার পরিষ্কার ধারণা বিজ্ঞানীদের ছিল না। সম্প্রতি বৃটেনের নিউ ক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে প্রাচীন সমুদ্রের পরিবেশ সৃষ্টি করে আঠারো কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বাই-কার্বনেট লবণ, হাইড্রোজেন, লৌহ-সমৃদ্ধ ম্যাগনেটাইট আকরিক ইত্যাদির ক্ষারীয় মিশ্রণকে ৯০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রাচীন হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের পরিবেশ সৃষ্টি করলে আঠার কার্বন পর্যন্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের মিশ্রণ তৈরী করতে সমর্থ হন। এই পরীক্ষা পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আরও দৃঢ় করল। (কমিউনিকেশন আর্থ এন্ড এনভায়ারমেন্ট)

১৬.●চীনা বিজ্ঞানীরা দুই বছর আগে রেসাস বানরের ক্লোন সম্পূর্ণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। বানরটি শারীরিকভাবে সুস্থ আছে বলে জানানো হয়েছে। বেশ কয়েকবারের প্রচেষ্টা তাঁরা এই কাজে সাফল্য পেলেন। স্মরণ করা যেতে পারে মানব ইতিহাসে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি ভেড়াকে ক্লোন করা হয়। বানর জাতীয় প্রাণীর প্রথম ক্লোন করা হয় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি ম্যাকাও বানরের। বিজ্ঞানীরা বরেন রেসাস বানরের সাথে মানুষের অনেক মিল থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ও রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে গবেষণায় রেসাস বানর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও পশুপ্রেমীদের এক সংস্থা ক্লোনিং এর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। (বিবিসি নিউজ)

২৪.●সম্প্রতি বৃটেনের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন মহাকাশ বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণে সৌরজগতের বাইরে ৮৫টি বহির্গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। বহির্গ্রহগুলির তাদের নিজ নিজ নক্ষত্রের চতুর্দিকে আবর্তনকাল ২০ থেকে ৭০০ দিন পর্যন্ত। এদের মধ্যে বেশ কিছু বহির্গ্রহের গড় তাপমাত্রা প্রাণ ধারণের অনুকূল বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়)

২৯.●প্রখ্যাত শিল্পপতি ও স্পেসএক্স এর সিইও, ইলন মাস্কের সংস্থা 'নিউরালিঙ্ক'-এর বিজ্ঞানীরা এই প্রথমবার মানুষের শরীরে মাইক্রোচিপ স্থাপন করতে সফল হল। (দ্য গার্ডিয়ান) ■

কার্বন ভিত্তিক। যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি। এখানেই রয়েছে গাছের (এবং অরণ্যভূমির) অনন্য ক্ষমতা। সকল জীব তার শ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলে কার্বন (CO_2 রূপে) ছেড়ে সংকটজনক পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করে তোলে। সেখানে গাছ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন (CO_2 রূপে) চুষে নেয়। শুধু চুষে নেয় না, সেই চুষে নেওয়া কার্বন মাটিতে চারিয়ে দিয়ে এবং নিজে সংরক্ষিত রেখে কার্বন সিঙ্ক বা সংরক্ষিত আধারের কাজ করে। কার্বন সিঙ্ক হল এমন উপাদান বা ব্যবস্থা যা কার্বন শোষণ করে বেশি নির্গমন করে অতি কম। শুধু তাই নয় উল্টে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দূষণের মোকাবিলায় অপরিসীম ভূমিকা পালন করে চলে।

সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার এক অব্যর্থ দাওয়াই রূপে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ ও অরণ্যসৃজন অভিযান চালাতে হবে। এটাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত।

বৃক্ষরোপণ ঃ অরণ্যসৃজন ও পুনর্নির্মাণ অভিযান

এই অভিযানের আকার ঠিক কেমন সেটা ঐ পুরসভা বা বনদপ্তর থেকে চারা পেয়ে দলবল নিয়ে রাস্তার ধারে বা এখানে ওখানে পুঁতে দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছবি তোলার সক্রিয়তা দিয়ে বোঝা যাবে না। সামান্য কয়েকটা তথ্য পরিসংখ্যান কিছুটা বুঝতে সাহায্য করবে। তার আগে কয়েকটি সংজ্ঞা স্পষ্ট করে নেওয়া উচিৎ।

* অরণ্যসৃজন বা অ্যাফরেস্টেশন (afforestation) – যে অঞ্চলে অরণ্যের আচ্ছাদন ছিল না সেখানে বনভূমি তৈরি করা হল অ্যাফরেস্টেশন।

* অরণ্য পুনর্নির্মাণ বা রিফরেস্টেশন (reforestation) – যে অঞ্চলে সাম্প্রতিক অতীতে বনভূমি ছিল যা হয় কেটে ফেলা হয়েছে বা অন্য কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেখানে পুনরায় অরণ্য তৈরি করা হল রিফরেস্টেশন।

* কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন – এটি হল কার্বন সিঙ্ক বা কার্বন পুলে কার্বন ধরে জমা করে রাখার প্রক্রিয়া। বায়ুমন্ডলীয় কার্বন প্রাকৃতিক উপায়ে ভূতাত্ত্বিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ায় কার্বন সিঙ্কে জমা হয়। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিরূপ বদল করে অরণ্য বিস্তার দ্বারা কার্বন বন্দি করার প্রসঙ্গে এই প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে।

●১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার চিলে (উচ্চারণভেদে চিলি)'তে চালানো হয়েছে দুনিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী অ্যাফরেস্টেশন প্রকল্প। সেখানে আইন করা হয়েছিল নতুন বৃক্ষরোপনের খরচের ৭৫% ভর্তুকি দেওয়া হবে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে জৈব বৈচিত্রে সমৃদ্ধ চিলের এই আইনের (ডিক্রী ল ৭০১) ফলাফলটাও আমাদের বিচার করতে হবে।

●আফ্রিকার ২০টা দেশ মিলে ৮০,০০০ কিলোমিটার গাছের দেওয়াল তৈরি করছে – গ্রেট গ্রীন ওয়াল। মহাদেশের পূর্ব প্রান্ত জিবুতি থেকে যা পশ্চিম প্রান্তে সেনেগাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

●স্ক্যান্ডিনেভীয় রাষ্ট্রগুলি গত এক শতাব্দীতে তাদের অরণ্যের আয়তন দ্বিগুণ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া করেছে ৫০ বছরে।

●সুইডেনের ৭০% এর বেশি জমি অরণ্যাবৃত করা হয়েছে।

●আফ্রিকার ইথিওপিয়া ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৫ মিলিয়ন হেক্টর অরণ্য পুনঃস্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। ২০১৯ এ একদিনে তারা ৩৫০ মিলিয়ন বৃক্ষরোপন করে রেকর্ড করেছে। (৩০শে জুলাই)

●মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অরণ্য বিষয়ক এক এন.জি.ও কর্মকর্তা জ্যাড ডালে 'X' (পূর্বতন ট্যুইটার) প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছেন তাঁর সংস্থা গত ১৬ বছরে ৬৫ মিলিয়ন গাছ লাগিয়েছে।

●উপরের উদাহরণগুলো থেকে মনে হতে পারে যে এগুলি বোধ হয় স্থানীয় বা বড়জোর রাষ্ট্রীয় স্তরের কার্যক্রম। আদৌ তা নয়। বর্তমানে প্রায় সমস্ত প্রকল্পগুলি আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন দ্বারা গৃহীত নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করে। আন্তর্জাতিকভাবে আই.পি.সি.সি ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি এবং বৃহৎ কর্পোরেশনগুলি এই সমস্ত প্রকল্পে অর্থ সরবরাহ করে।

●প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী ভারতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা [রাষ্ট্রগতভাবে নির্ধারিত অংশদান (Nationally Determined Contributions – NDC) হল – ২.৫ থেকে ৩ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) এর সমতুল্য কার্বন সিঙ্ক নির্মাণ করতে হবে অরণ্যভূমির আচ্ছাদন বাড়িয়ে। ভারত এই আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য তার ৩৩% ভৌগোলিক অঞ্চলকে অরণ্য আচ্ছাদনে আনতে চায়।

●২০১৯-এ 'সায়েন্স' জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র দাবি করেছে পৃথিবী আরো ০.৯ বিলিয়ন (অর্থাৎ ৯০ কোটি) হেক্টর বনভূমি ধারণ করতে পারে। তুলনায় সুবিধা হবে তাই উল্লেখ করা যায় গোটা ভারতের আয়তন হল ৩২.৯ কোটি হেক্টর!

ঐ একই গবেষণাপত্র বলছে জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে গাছের রয়েছে এমন অনন্য ক্ষমতা যে তারা ২০০ গিগাটন (গিগাটন – $১০^{১২}$ বা ১ লক্ষ কোটি কিলোগ্রাম) কার্বন চুষে জমা রাখতে পারে।

●**বন চ্যালেঞ্জ (Bonn Challange)** ঃ এটি একটি বৈশ্বিক প্রয়াস। যার লক্ষ্য ২০২০-র মধ্যে ১৫০ মিলিয়ন ও ২০৩০-এর মধ্যে ৩৫০ মিলিয়ন হেক্টর অবক্ষয়িত ও বিনষ্ট অরণ্যভূমিকে পুনর্গঠিত করা। এটি ২০১১-র ২রা সেপ্টেম্বর জার্মানির বন এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনসারভেশন অফ নেচার (IUCN) এর উদ্যোগে কার্যকরী হয়। ২০২০-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে তাদের হিসেবে ১ বিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন সম্ভব হবে। যা নির্গমন অন্তরকে ২০% কমিয়ে আনতে পারবে। [নির্গমন অন্তর (Emission gap) হল NDC অনুযায়ী বৈশ্বিক গ্রীণহাউস গ্যাসের নির্গমন এবং শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার থেকে ১.৫°-২.০° সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা ধরে রাখার জন্য নির্ধারিত নির্গমন মাত্রার মধ্যেকার ফারাক]

●৬১টি দেশ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে ভারত অন্যতম। তারা শপথ নিয়েছে ২০২০ ও ২০৩০ এর মধ্যে যথাক্রমে ১৩ ও ২১ মিলিয়ন হেক্টর অরণ্যভূমি পুনরুদ্ধার করা হবে। এই প্রকল্প মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও নাগাল্যান্ডে কার্যকরী হচ্ছে। পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী মহারাষ্ট্র ১ দশকের মধ্যে ১.৮৩ মিলিয়ন হেক্টর পুনরুদ্ধার করে ফেলেছে।

*এরকম আরো বৈশ্বিক উদ্যোগ হল ট্রিলিয়ন ট্রি ডিক্লারেশন, REDD+ (বনভূমির অবক্ষয় ও ধ্বংস থেকে কার্বন নির্গমন ব্যবস্থাপনা) ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রকল্পের কী পরিমাণ ওজন রয়েছে তা বোঝা যায় যখন ২০১৯-এ সংযুক্ত রাজ্যে (ইউ. কে) নির্বাচনের সময় প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিগুলি বিরাট সংখ্যক বৃক্ষরোপণের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি জলবায়ু সমঝোতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেবার ঘোষণা যিনি করেছিলেন সেই পূর্ব রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত ট্রিলিয়ন ট্রি অভিযানের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এ ধরনের প্রকল্পগুলিতে কত টাকা পয়সা লাগে সে বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি করার জন্য এই প্রকল্পে যুক্ত কর্মকর্তাদের সাফল্যের জন্য যে চাহিদাগুলি উঠে আসে তার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। উন্নত মানের বীজ ও চারা চাই। ড্রিপ ইরিগেশনের (নিয়মিত চারাগাছের গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা জল দেওয়ার সেচ পদ্ধতি) ব্যবস্থা চাই। নিয়মিত সময় অন্তরালে চারা ও গাছের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার এবং সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা চাই। উপগ্রহ চিত্র দ্বারা নজরদারি চাই। জিও ট্যাগিং চাই ইত্যাদি। এগুলি বছরের পর বছর চলতে থাকবে যতদিন না চারাগাছগুলো বৃদ্ধি পেয়ে অরণ্য সৃষ্টি করে।

কেবল একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। হিমাচল প্রদেশে ২০১৬-১৯-এর মধ্যে বনসৃজনের তথ্য ও বাজেট সাহায্য বিশ্লেষণ করে ২০২৪ থেকে আগামী ১০ বছরের জন্য প্রায় ৭৬০ কোটি টাকা খরচ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছে।

সুতরাং আমরা সমাজের মুষ্টিমেয় সৈনিক যারা গাছ লাগাই, গাছ উপহার দিই ইত্যাদি জাতীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোন বাস্তব জায়গা নেই। গোটা দুনিয়ার হর্তা-কর্তা সেরা ধনকুবের মাথারা, রাষ্ট্র নেতারা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বৃক্ষরোপণের মহাযজ্ঞ চালাচ্ছেন। কোটি কোটি ডলার খরচ করছেন। এটাও স্মরণে রাখা দরকার মানুষের দ্বারা 'ডিফরেস্টেশন' বা অরণ্যভূমি ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কার্যকরী করার ক্ষমতাও এঁদের হাতেই রয়েছে।

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণ–দাবি এবং বাস্তবতা

বিষয়টি বিচার করতে হবে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও পরিসংখ্যানগত ফলাফল উভয় দিক থেকেই। প্রথমে গাছেদের এই যে বিশেষ ভূমিকা – 'কার্বন ধরো, কার্বন ভরো' (কার্বন ক্যাপচার ও কার্বন সিঙ্ক) – এর বিচার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ উপরোক্ত ভূমিকার প্রচার একপেশে, পক্ষপাতদুষ্ট। গাছ যেমন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন গ্রহণ করে ও অক্সিজেন নির্গত করে ঠিক তেমনি শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে। কেবলমাত্র ক্লোরোফিল যুক্ত কোষগুলি সূর্যালোকের উপস্থিতিতে প্রথম প্রক্রিয়াটি সচল রাখতে পারে, কিন্তু উদ্ভিদদেহের সকল কোষ সর্বদা শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত করে। এই দুটি প্রক্রিয়ার তুলনাত্মক পরিসংখ্যান আজও নির্দিষ্ট করা যায় নি। বস্তুতঃ এর কোন সর্বজনীন স্থির অনুপাত নেই, এটাই অধ্যয়ন থেকে উঠে আসে।

দ্বিতীয়তঃ যদি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটিকে প্রধান ধরা হয় এবং শ্বসন দ্বারা উদ্ভিদের অক্সিজেন গ্রহণ নগণ্য ধরা হয় তবে উপরোক্ত স্থির আনুপাতিক যুক্তি কাঠামোয় বিপুল অরণ্য ও বিপুল পরিমাণ বৃক্ষরোপন বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। অনেকেই মনে করতে পারেন তাহলে সে দারুন

হয়। পরিশুদ্ধ, দূষণহীন বাতাস উপভোগ করবে জীবজগৎ।

সংক্ষেপে এর ফলাফলগুলিও জেনে নেওয়া দরকার। অক্সিজেনের মাত্রা যত বাড়বে পৃথিবী জুড়ে দহনের মাত্রা তত বাড়বে। আগুন লাগলে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়বে, নেভানো মুশকিল হয়ে যাবে। জীবজগতে শ্বসনের হার বেড়ে যাবে। বয়স বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুতগতি প্রাপ্ত হবে। আরো এগিয়ে ভাবলে রক্তপ্রবাহে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে গেলে কোষ আবরণী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ফুসফুস অকার্যকরী হতে থাকা ইত্যাদি অসংখ্য প্রাণঘাতী জটিলতার সৃষ্টি হবে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি নাইট্রোনের অভাব ঘটিয়ে পুষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। খাদ্য শৃঙ্খলের অন্যরাও প্রভাবিত হবে।

সারমর্ম হল 'বেশি ভাল ভাল নয়'!

তৃতীয়তঃ দক্ষিণ আমেরিকার সুবৃহৎ আমাজন বর্ষাবনে অরণ্যধ্বংস, দাবানলের সংখ্যায় (২০১৯ এ ৮০,০০০) প্রচন্ড বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনে তথা বাস্তুতন্ত্রে গভীর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে – এমন সংবাদ অনেকেরই জানা। একে অস্বীকার করা যায় না। এর পেছনে প্রাকৃতিক শর্ত বাদ দিলে মানুষের যে ভূমিকা – সেটা কাদের, কোন্ শ্রেণীর মানুষের তাও অতি সহজেই বিচার করা যায়। সকল তথ্যই মজুত রয়েছে।

এই প্রসঙ্গকে ধরে বিজ্ঞানীদের কিছু প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান লব্ধ সিদ্ধান্তের দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির আবহবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্কট ডেনিং সহ অধ্যাপক মাইকেল ই মান, জন ফলি ইত্যাদিদের মতামত হল – আমাজন বর্ষাবন পৃথিবীর ২০% অক্সিজেন যোগান দেয় এটা কেবল অতিরঞ্জিত নয় – ভুল তথ্য। বিশালাকার বর্ষাবন হওয়া সত্ত্বেও তা পৃথিবীর জলচক্র, কার্বনচক্র ও জলবায়ুর একটা অংশ মাত্র নিয়ন্ত্রণ করে। ২০% নয় খুব বেশি হলে পরিমাণটা ৬% এর কাছাকাছি হতে পারে। কিন্তু এই হিসেবটাও ভ্রমাত্মক এই জন্য যে সম্পূর্ণ আমাজন বর্ষাবনকে ধ্বংস করে দিলেও অক্সিজেনের মাত্রা ৬% কমে যাবে না। যদি হিসেবটা ২০% ও হয় তাহলেও ২০% কমবে না। অক্সিজেন তৈরিতে অরণ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও আরও বহু শর্ত এবং তাদের মধ্যেকার তুলনামূলক ভারসাম্য এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন নোনা জলের অনুবীক্ষণিক ফাইটো প্লাংটন অক্সিজেন তৈরিতে বিপুল ভূমিকা রাখে। কিন্তু শ্বসন প্রণালীর দ্বারা তার একটা বিরাট অংশ সামুদ্রিক জীবজগতের (বায়োস্ফিয়ার) নিজস্ব অক্সিজেন চক্রে ফিরে যায়। ডেনিং বলছেন **"যদি পৃথিবীর সমস্ত জৈব বস্তু একই সাথে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তবে মাত্র ১% অক্সিজেন খরচ হবে। ... বহু মিলিয়ন বছর টিকে থাকার মত যথেষ্ট অক্সিজেন বাতাসে রয়েছে। এবং এই পরিমাণটা নির্ধারিত হয় ভূমির ব্যবহার দ্বারা নয় – ভূতত্ত্ব (geology) দ্বারা।"** অর্থাৎ আমরা যা ভাবি পৃথিবী ও পরিবেশ তার থেকে একটু বেশি জটিল।

চতুর্থতঃ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির যে তত্ত্ব বহুল প্রচারিত সে বিষয়ে **সমীক্ষণ পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০২২ সংখ্যায়** বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন শুধু এটুকুই বলা যায় গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীদের দ্বিধাহীন মতামত হল 'কার্বন ডাই অক্সাইড সমেত সমস্ত গ্রীণহাউস গ্যাসগুলির মধ্যে জলীয় বাষ্পই পৃথিবীর উষ্ণায়নের জন্য ৯৭% দায়ী।' [দ্য ফিজিক্স অব অ্যাট্মস্ফিয়ার, তৃতীয় খন্ড – জন হাউটন]

এটা জানা কথা যে উদ্ভিদ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়। অতএব তারা বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প ছাড়ে। প্রজাতি ভেদে, পাতার আকার ও আয়তন ভেদে, আবহাওয়ার তারতম্য ভেদে এই বাষ্পমোচনের পরিমাণ বিভিন্ন। সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন প্রক্রিয়ার তুলনায় কী পরিমাণ জলীয় বাষ্প গড়পড়তা বায়ুমন্ডলে মুক্ত হচ্ছে তার কোন সার্বিক অধ্যয়ন এখনো পর্যন্ত করা যায় নি। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অরণ্য যে বিপুল পরিমাণ গ্রীণ হাউস গ্যাস ছাড়ে (জলীয় বাষ্প রূপে) এটা প্রমাণিত।

শুধু তাই নয় ২০১৪-র এক অধ্যয়ন বলছে গাছেরা যে উদ্বায়ী গ্যাস ছাড়ে তা পৃথিবীকে উষ্ণ করে তোলে অন্যভাবেও। শিল্প ও যানবাহন থেকে উৎপন্ন প্রদূষক (pollutants) বাতাস বাহিত হয়ে ওই উদ্বায়ী গ্যাসের সাথে মিশে যথেষ্ট পরিমানে ওজোন (O_3) এবং মিথেন (CH_4) তৈরি হয় যা একেকটি গ্রীন হাউস গ্যাস।

পঞ্চমতঃ বিভিন্ন অধ্যয়ন অরণ্য দ্বারা তাপ শোষণ করার ক্ষমতার বিষয়ে যে বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে এসেছে তা এক কথায় চমকপ্রদ। যেমন বর্তমানে ইউরোপীয় অরণ্যের প্রায় ৮৫% হল মনুষ্যকৃত ও মনুষ্য নিয়ন্ত্রিত। এই বনাঞ্চলের গত ২৫০ বছরের ইতিহাস দেখাচ্ছে এগুলি ঠান্ডা করার বদলে উষ্ণতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। গবেষকরা নিশ্চিত সহজাত (native) ফিকে আচ্ছাদনযুক্ত চওড়া পাতা বিশিষ্ট গাছের অরণ্যকে প্রতিস্থাপিত করে ঘন আচ্ছাদনযুক্ত সরলবর্গীয় (Coniferous) [যেমন পাইন, ফার – ইত্যাদি সুচালো পাতা বিশিষ্ট গাছ] বৃক্ষের অরণ্য এর অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ তারা বেশি তাপ শোষণ করে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে

যেখানে গাছ দ্রুতগতিতে বাড়ে সেখানে যথেষ্ঠ পরিমাণে জলীয় বাষ্প নির্গত করে। মেঘ তৈরিতে সাহায্যকারী শর্ত যোগায়। এ ধরনের অরণ্য শীতলকারক। (এখানে জলীয় বাষ্পের গ্রীন হাউস গ্যাস রূপে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক ভূমিকার ওপর এই শর্তটা আধিপত্য করে। একে পরস্পর বিরোধী মনে করলে বিভ্রান্ত হতে হবে। এমনই পরস্পর বিরোধী প্রধান-অপ্রধান শর্তগুলির পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে দিয়েই গতিশীল সাম্য অর্জিত হয়)।

অন্যদিকে সমোষ্ণমন্ডল বা টেমপারেট জোনে (মেরুবৃত্ত ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশ), তুষারাবৃত্ত অঞ্চলে যেখানে গাছের বৃদ্ধি ধীরে হয় সেখানে অরণ্যসৃজন বিপরীত ভূমিকা পালন করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্ত হল মাঠ-ময়দান-ন্যাড়া জমি-তুষারবৃত প্রান্তর থেকে গাড় সবুজ ঘন আচ্ছাদনযুক্ত অরণ্য অনেক বেশি পরিমাণ তাপশক্তি শোষণ করে। এই শোষণের পরিমাণ বেশি বা কম হতে পারে গাছের প্রজাতি এবং পাতার রং এর উপর। সুতরাং বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান, গাছের প্রকৃতি ও প্রজাতি বিচার করতে হবে।

ষষ্ঠতঃ একই কথা প্রযোজ্য কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন বা কার্বন ধারণ করার বিষয়ে। প্রথমতঃ স্বাভাবিক সহজাত অরণ্যের কার্বন ধরে রাখার ক্ষমতা মানুষ দ্বারা সৃষ্ট অরণ্য থেকে বেশি। একটা পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ও দন্ডায়মান অরণ্য বাগিচা ক্ষেত্রের থেকে ৪০ গুণ এবং কৃষিজ বনের (agro forestry) থেকে ৬ গুণ বেশি কার্বন ধারণ করতে পারে । এর কারণ একটা নয় অনেকগুলো।

●প্রধান কারণ হল কোন বনভূমি সৃজন বা পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সেখানকার প্রকৃতিগত, সহজাত জৈব বৈচিত্র। একে কার্যতঃ কোন গুরুত্ব না দিয়ে মনোকালচার বা একজাতীয় বৃক্ষ বা উদ্ভিদ দ্বারা অরণ্য তৈরি করা। যেমন ২০১১-তে বন চ্যালেঞ্জ এক দশকের মধ্যে ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি তৈরির যে শপথ নিয়েছিল তার অর্দ্ধেকই হল একজাতীয় রোপণ। এর প্রতীকী গুরুত্ব থাকতে পারে কিন্তু কার্বন ধারণ করার প্রশ্নে প্রভাব নগণ্য।

●সাভানা তৃণভূমি প্রাকৃতিকভাবেই সমৃদ্ধ কার্বন সিঙ্ক। এই অঞ্চলগুলির সহজাত জৈব বৈচিত্র অস্থিতিশীল করে দিলে সেখানে সংরক্ষিত কার্বন মুক্ত হতে থাকে। পৃথিবী আরো ৯০ কোটি হেক্টর বনাঞ্চল ধারণ করতে পারে এই মতের প্রবক্তারা যে অঞ্চল চিহ্নিত করেছেন তার বেশিরভাগটাই হল সাভানা। আগ্রাসী বৃক্ষরোপণ অভিযানের মাথারা সাভানাকে মনে করেন অপচয়িত বা অবক্ষয়িত বনভূমি। প্রকৃতপক্ষে এদের রয়েছে অনন্য জৈব বৈচিত্র। এই অঞ্চলে একজাতীয় বা সীমিত বৈচিত্রের সৃষ্ট অরণ্য থেকে এরা পূর্বে অনেক সমৃদ্ধ কার্বন ধারক ছিল।

●চিলে বা চিলির বহু বিজ্ঞাপিত যে প্রকল্পের উল্লেখ করে বৃক্ষরোপন অভিযানের ভেতরে প্রবেশ করা হয়েছে তার ফলাফলের অধ্যয়নটা সামনে নিয়ে আসা দরকার। জৈব বৈচিত্রে ভরপুর স্বাভাবিক অরণ্যকে প্রতিস্থাপিত করে (যদিও তা ঘোষিত লক্ষ্য ছিল না!) লাভজনক, দ্রুত বর্ধনশীল, একজাতীয় উদ্ভিদের অরণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ৭৫% সরকারী ভর্তুকি ব্যবহার করে জমির মালিক (প্রকৃতপক্ষে শাসন প্রণালীর কর্তারা) সহজাত অরণ্য নিধন করে কৃত্রিম অরণ্যের আচ্ছাদন বাড়িয়েছেন। জৈব বৈচিত্রের ক্ষয় নিশ্চিত করা হয়েছে। কার্বন ধারণ ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণাপত্রের অন্যতম লেখক স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এরিক ল্যাম্বিন মন্তব্য করেছেন "যদি বৃক্ষরোপণের জন্য উৎসাহ ভাতার নীতি সঠিকভাবে পরিকল্পিত না হয় এবং নিকৃষ্টভাবে কার্যকরী হয় তবে কেবল জনগণের টাকার অপচয় হয় না বরং অধিক কার্বন মুক্ত করে ও জৈব বৈচিত্রের ক্ষতি সাধন করে। ... এটা হল ঠিক বিপরীত যা এই নীতিগুলোর ঘোষিত লক্ষ্য।"

রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনস, KEW এবং বোটানিক গার্ডেনস কনসারভেশন ইন্টারন্যাশনাল (BGCI) তাদের পর্যবেক্ষণে বলছে বৃক্ষরোপণের ভুল পরিকল্পনা ও বেঠিক কার্যকরণ কেবল জৈব বৈচিত্র নষ্ট করে না বা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন বাড়িয়ে দেয় না, ভূমিরূপ ও মানুষের জীবিকার উপর প্রবল নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। দ্রুতবর্ধনশীল, অ-সহজাত (non native) – একজাতীয় বৃক্ষ দ্বারা তৈরি অরণ্য জীবনকে সাহায্য করে না।

অধ্যাপক-গবেষকরা যে ভুল পরিকল্পনা-ভুল কার্যকরণের কথা উল্লেখ করছেন তার উৎস সন্ধান করা অবশ্য প্রয়োজন। না হলে অতিকায় বৃক্ষরোপণ অভিযানগুলির স্বরূপ স্পষ্ট হয় না। কারণ আর যাই হোক ডুবে যাওয়ার জন্য কেউ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লগ্নী করে না।

[বাকি অংশ পরের সংখ্যায়]

স্মরণীয় বিজ্ঞানী ঃ

বরেণ্য গণিতবিদ – রাজচন্দ্র বসু

– দিব্যেন্দু মজুমদার

রাজচন্দ্র বসু

বিজ্ঞান সাধক বাঙালিদের মধ্যে স্বল্পপরিচিত একটি নাম রাজচন্দ্র বসু। বিশ্ব গণিতের আঙ্গিনায় যদিও রাজচন্দ্র বসু এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে অয়লার (Euler) একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তার নাম অয়লারের কনজেকচার (Euler's conjecture)। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাজচন্দ্র বসু ও তাঁর সহযোগী ই. টি. পার্কার এবং শঙ্কর শ্রীখন্ড অয়লারের ঐ তত্ত্ব বা কনজেকচারকে ভুল প্রমাণ করেন। এটি ছিল গণিতের জগতে এক আলোড়নকারী কাজ। এরপর থেকে বিশ্ব গণিতজগতে একটি বিশেষণ জনপ্রিয় হয় – অয়লার্স স্পয়লার্স (Euler's spoilers)। AMS বা আমেরিকান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটির সম্মেলনে এটি পেশ করা হয়। এবং এরপরই হৈ হৈ কান্ড।

ঐ সম্মেলনের খবর প্রকাশিত হতেই নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক স্বয়ং রাজচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎকার নেন এবং সেই সাক্ষাৎকার নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে রাজচন্দ্র বসুর কাজের গুরুত্ব কত। (April 26, 1959, New York Times, Sunday edition)।

অয়লারের ঐ তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করা – পরিসংখ্যান বা রাশিবিজ্ঞান তত্ত্বে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। পরবর্তীতে যা বোস-মেইসনার (Bose-Meisner alegebra) বীজগণিত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদে জন্ম রাজচন্দ্র বসুর। পিতা প্রতাপচন্দ্র বসু ছিলেন চন্দননগরের খলসানি অঞ্চলের বিখ্যাত বসু পরিবারের সন্তান।

রাজচন্দ্র বসুর বিদ্যালয় শিক্ষালাভ হরিয়ানার রোহতক-এ এক সরকারি বিদ্যালয়ে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দিল্লির হিন্দু কলেজ থেকে গণিতে বি.এ অনার্স করে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ব্যবহারিক গণিতে এম.এ ডিগ্রী লাভ। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ গণিতে দ্বিতীয় এম.এ করেন প্রথম স্থানাধিকারী হয়ে। এরপরে রাজচন্দ্র বসু ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অধীনে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু অর্থাভাবে মাঝপথেই বন্ধ হয় গবেষণা। তাই জ্যামিতির উপর বিভিন্ন বই লেখা শুরু করেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আই. এস. আই বা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর রাজচন্দ্র বসু আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ৭০ বছর বয়সে ওনার কর্মজীবনে অবসর গ্রহণ হয়।

অয়লারীয় তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করা ছাড়াও Design theory, Finite Geometry theory of errors, Correcting codes (ডিজাইন থিয়োরি, ভ্রম সংশোধন তত্ত্বে সসীম জ্যামিতি, কোড সংশোধন) এর উপর ওনার কাজ পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য হয়। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ, সমরেন্দ্র নাথ রায় এর সাথে করেন বহুচল (multivariate) বিশ্লেষণের কাজ। এছাড়াও ভারতে থাকাকালীন ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে রোনাল্ড ফিশার ভারত সফরে আসেন ও রাজচন্দ্র বসুর সাথে যুগ্মভাবে 'পরীক্ষা নকশা' নিয়ে কাজ করেন।

জ্যামিতিক উপপাদ্যে প্রচলিত BCH code রাজচন্দ্র বসু ও ডি. কে. রায়চৌধুরির নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত।

এই বিশ্ববরেণ্য গণিতবিদ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর প্রয়াত হন। ■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব অষ্টম অংশ)

'ভাইটালিজম' এর মতো অলৌকিক বিশ্বাস রসায়ন বিদ্যার জগৎ থেকে অপসারিত হয়ে বস্তুবাদ গড়ে ওঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল। বস্তুবাদের আরেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বস্তু কি? তা জানা। দার্শনিকরা শিখিয়েছেন যে বস্তু গড়ে ওঠে পরিমাণে ও গুণে। এই পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন হয় এবং তার বিপরীত ঘটনা (Vice Versa)-ও ঘটে থাকে। এই হল বস্তুজগতের পরিবর্তনশীলতার শর্ত। এই পরিবর্তনটাই গতি।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের আগে (ক্যাথোড রশ্মির পরীক্ষা) পর্যন্ত রসায়ন বিজ্ঞানে বস্তুর ক্ষুদ্রতমরূপ ছিল এক একটি পরমাণুই। যদিও সেই পরিমাণুগুলির স্থান পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় শক্তিকেও পরিমাণে ও গুণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা হতো। অর্থাৎ শক্তির রূপান্তর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' পুস্তকের 'দ্বান্দ্বিকতাবাদ' নামক নিবন্ধে লিখেছেন – **'প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ধরনে, কেবল বস্তু বা গতির (তথাকথিত শক্তি) পরিমাণগত সংযোজন ও পরিমাণগত বিয়োজনের মাধ্যমেই গুণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে।**

প্রকৃতিতে সব গুণগত পার্থক্যই নির্ভর করে রাসায়নিক সংযুক্তির (composition) উপরে অথবা গতির (শক্তির) বিভিন্ন পরিমাণ বা ধরনের উপরে কিংবা, প্রায় সব সময়েই যেটা ঘটে, উভয়ের উপরেই। সুতরাং বস্তু বা গতির সংযোজন বা বিয়োজন ছাড়া, অর্থাৎ কোনো বিবেচ্য জিনিসের পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া, জিনিসটির গুণগত পরিবর্তন সাধন অসম্ভব। এইভাবে দেখলে, সুতরাং হেগেলের রহস্যময় সূত্রটি কেবল যে খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় তাই নয়, এমন কি বরং স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়।'

'ভাইটালিজম' তত্ত্বের খন্ডন হয়েছিল যে সময়কালে, সেই সময়ই বস্তুর পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক রসায়ন বিজ্ঞানে আবিষ্কার হয়ে গেছিল। এই আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্ব না দেওয়া গেলেও সর্বাধিক কৃতিত্ব দেওয়া যায় রুশী রসায়ন বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিফকে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ যেমন জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আরো দৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করে চলেছে, তেমনি মৌলের বিবর্তনের রহস্য যা মেন্ডেলিফ আবিষ্কার করেছিলেন, যত দিন গেছে তত তার ভিত আরো মজবুত হয়েছে। এর কারণ উভয় ক্ষেত্রেই বস্তুজগতের **স্বতঃসিদ্ধ** এই নিয়মেরই প্রকাশ দেখা যায়।

আমরা বিগত সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলাম যে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানুষ ৫২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছিল। এর কিছুকাল পরে বার্জেলিয়াস ৫৪টি মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব সমন্বিত একটি টেবিল বা সারণি প্রস্তুত করেন। তিনি অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ষোল ধরে অন্যগুলির পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন। পরমাণুর যাবতীয় ধর্ম অর্থাৎ **গুণ,** তার পারমানবিক গুরুত্ব অর্থাৎ **পরিমাণের** সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত থাকতে পারে, সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন অনেক রসায়ন বিজ্ঞানীই। বার্জেলিয়াসের টেবিলটি তাই নিছকই মৌলের নাম ও পারমাণবিক গুরুত্বের সারণী ছিল না। এই টেবিল তৈরীর আগে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী জোহান উল্কগ্যাং ডেবোনিয়ার একটা ছোট প্রয়াস চালান। তিনি লক্ষ্য করেন (ব্রোমিন, ক্লোরিন, আয়োডিন) অথবা (ক্যালশিয়াম, স্টনশিয়াম, বেরিয়াম) বা (সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম) – এই গ্রুপগুলিতে ধর্মের সাদৃশ্য আছে। আরো আশ্চর্য বিষয় হল প্রতিটি গ্রুপের মধ্যবর্তী মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব, অন্যদুটির মধ্যবর্তী হচ্ছে। ডেবোনিয়ার এই গ্রুপগুলিকে নাম দেন 'ট্রায়াডস্' অর্থাৎ ত্রয়ীসমূহ।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির কার্লসরুহে (Karlsruhe)-তে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কেমিকাল কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন একশো চল্লিশজন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী। কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেন বিখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী স্তানিস্লাও ক্যানিজারো। তিনি বক্তব্যে এবং প্যামপ্লেট বিলি করে মৌলিক পদার্থের ধর্মের সঙ্গে তাদের পারমাণবিক গুরুত্বের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক থাকার সম্ভাবনাকে সভায় তুলে ধরেন। এই জন্য তিনি বার্জেলিয়াসের ৫৪টি মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের টেবিলটি সকলের কাছে তুলে ধরেন। এই সম্মেলনে মেন্ডেলিফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সময় স্নাতক স্তরে পড়াশোনার জন্য জার্মানিতে ছিলেন।

এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের বছরেই বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন দুই বিজ্ঞানী, একজন রসায়ন বিজ্ঞানী রবার্ট উইলহেলম্

বুনসেন (বুনসেন বার্নারের জন্য রসায়ন মহলে পরিচিত), অপরজন পদার্থ বিজ্ঞানী গুস্তাভ রবার্ট কার্চফ। এই যন্ত্র প্রসঙ্গে বলার আগে নিউটন কর্তৃক সূর্যালোকের সাতরঙা বর্ণালী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। দৃশ্যমান আলোকরশ্মিকে তেশিরা প্রিজমের মধ্যদিয়ে প্রতিসৃত করে সাতরঙা বর্ণালী তিনি তৈরি করেছিলেন। সাতরঙা বর্ণালীর যেকোনো বর্ণের আলোকে তেশিরা প্রিজমে পুনরায় প্রতিসরণ ঘটালে একমাত্র সেই বর্ণের আলোই পাওয়া যাবে। এর থেকে বলা যায় বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণের আলো দৃশ্যমান সাদা আলোর মৌলিক অংশ।

নিউটনের বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বুনসেন ও কার্চফ মৌলগুলির কেলাসকে উত্তপ্ত করলেন এই ভেবে যে উত্তপ্ত অবস্থায় এগুলো শক্তি বিকিরণ করবে। এই বিকিরণকে কোনো উপায়ে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে পরিণত করে একই প্রক্রিয়ায় প্রিজমের মধ্য দিয়ে চালনা করলে একই রকম বর্ণালী তৈরি হতে পারে। (চিত্র-১) কোনো বস্তুকে (যেমন ধাতুকে) প্রচন্ড উত্তপ্ত করলে তার রঙের পরিবর্তন হতে আমরা দেখেছি। এই দুই বিজ্ঞানীর পরিকল্পনার উৎস এই ঘটনা। তাঁরা এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মৌলের আলাদা আলাদা ধরনের (pattern-এর) উজ্জ্বল আলোর রেখা উত্তপ্ত অবস্থায় বর্ণালী হিসেবে পেলেন। এগুলো সবই ছিল রেখা বর্ণালী, অর্থাৎ আলোক রেখাগুলির মাঝে আছে কালো বিভেদ অঞ্চল। এই প্রতিটি বর্ণালী মৌলভেদে পরস্পর স্বতন্ত্র, আমাদের আঙুলের ছাপের (ফিঙ্গার প্রিন্ট) মতো। যদি অজানা মৌল নিয়ে এই গবেষণা একইভাবে চালানো হয়, সে সময়কার আবিষ্কৃত মৌলগুলির এরকম ফিঙ্গার প্রিন্টের বাইরে অজানা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে। অজানা এই বর্ণালী হবে অজানা মৌলের নিজস্ব। মৌলিক পদার্থ সনাক্তকরণে রাসায়নিক বিক্রিয়া জনিত সংশ্লেষণ তাপ প্রয়োগ করে আকরিক থেকে মৌলগুলিকে আলাদা করার পদ্ধতি এবং তড়িৎ বিশ্লেষণের পর বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার হল নতুন পদ্ধতির সংযোজন।

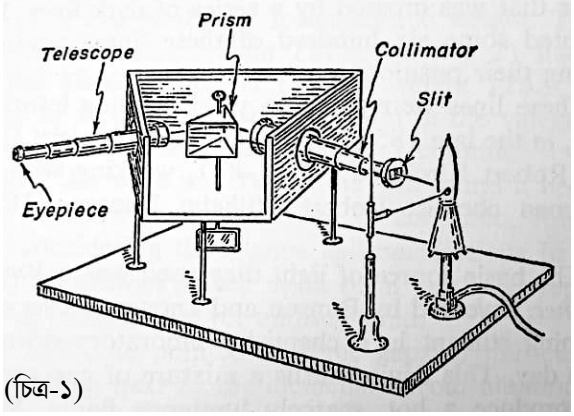

(চিত্র-১)

এই নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বুনসেন ও কার্চফ আবিষ্কার করলেন ঊর্ধাকাশের নীলাভ বর্ণের সদৃশ বর্ণের সিজিয়াম, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা আবিষ্কার করলেন লাল বর্ণের মৌল রুবিডিয়াম। ঐ বছরই ইংরেজ পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানী ডবলু ক্রুকস আবিক্ষার করলেন থ্যালিয়াম (গ্রীক শব্দ থ্যালাস অর্থাৎ "কচি সবুজ ডাল" থেকে এই নামকরণ।) বর্ণালীতে চমৎকার এক সবুজ রেখা পাওয়ায় এই নামকরণ হয়েছিল।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার বেগুয়ের ডে স্যানকোরউইস ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে একটি চোঙাকৃতির লেখচিত্র (Cylindrical graph) তৈরি করেন। এখানেও সমর্ধমী মৌলগুলি পর্যায়ক্রমিকভাবে আসছিল। (চিত্র-২)

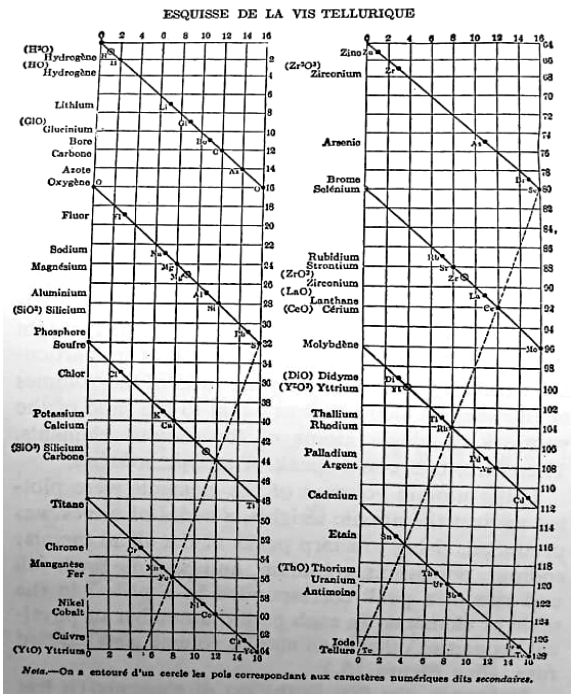

(চিত্র-২)

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী টি. এইচ রিখটার একটি নতুন মৌলের বর্ণালী বিশ্লেষণ করবেন ঠিক করেন। কিন্তু তিনি বর্ণান্ধ ছিলেন। তাই তাঁর সহকারী রেইচকে এই কাজ করতে বলেন। রেইচ বর্ণালীতে অত্যন্ত উজ্জ্বল নীল রেখা দেখেছিলেন। উজ্জ্বল নীল রঞ্জক পদার্থ "ইন্ডিগো" (নীল) থেকে এই মৌলটির নাম তাঁরা দেন "ইন্ডিয়াম"।

নতুন মৌল আবিষ্কারের সাথে সাথে চলছিল মৌলের ধর্ম ও পারমাণবিক গুরুত্বের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়। ১৮৬৪

খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রসায়ন বিজ্ঞানী জন আলেকজান্ডার রেইনা নিউল্যান্ডস্ এমন একটি তালিকা প্রস্তুত করেন, যা ছিল মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে একটি টেবিল। এই টেবিলে সাধারণভাবে সাতটি করে মৌলকে উল্লম্বভাবে রাখা হয়েছিল। ফলে আনুভূমিকভাবে এক একটা পর্যায়তে সমধর্মী মৌলগুলি এসে হাজির হল। পটাশিয়ামের পাশে সোডিয়াম, গেলেনিয়ামের পাশে হাজির সমধর্মী সালফার, ক্যালশিয়ামের পাশে সমধর্মী ম্যাগনেশিয়াম। এমন আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া চলে। নিউল্যান্ডস একে ল অফ অকটেভস্ (সঙ্গীতের সাতটি সুরের মতো, যেখানে অষ্টম সুরটি প্রায় প্রথমের মতো) বলে উল্লেখ করেন। নিউল্যান্ডস্ এর এই তালিকায় তখনো পর্যন্ত সবকটি মৌল স্থান পায় নি। মাত্র ৫১টি মৌল এই তালিকায় ছিল। (চিত্র-৩)

No.		No.		No.		No.		No.		No.		No.		No.	
H	1	F	8	Cl	15	Co Ni	22	Br	29	Pd	36	I	42	Pt Ir	50
Li	2	Na	9	K	16	Cu	23	Rb	30	Ag	37	Cs	44	Tl	53
Ga	3	Mg	10	Ca	17	Zn	25	Sr	31	Cd	38	Ba V	45	Pb	54
B	4	Al	11	Cr	19	Y	24	Ce La	33	U	40	Ta	46	Th	56
C	5	Si	12	Ti	18	In	26	Zr	32	Sn	39	W	47	Hg	52
N	6	P	13	Mn	20	As	27	Di Mo	34	Sb	41	Nb	48	Bi	55
O	7	S	14	Fe	21	Se	28	Ro Ru	35	Te	43	Au	49	Cs	51

FIG. 13. The "law of octaves," published in 1864 by J. A. R. Newlands, was a forerunner of Mendeléev's Periodic Table.

(চিত্র-৩)

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে কটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছিল, তাদের বর্ণালীও তৈরি হয়ে গেছিল। মহাকাশে থাকা সকল উজ্জ্বল বস্তু থেকে আসা আলোর বর্ণালীতেও সেই সকল বস্তুর বর্ণালীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল যেগুলো ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত। এমন পরিস্থিতিতে এই বছর সৌর প্রজ্বালের বর্ণালীতে (সৌর প্রজ্বাল হল সূর্যে অবস্থিত গ্যাসীয় বস্তুর মেঘ) এমন এক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেল যা তখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে আছে বলে জানা ছিল না বৈজ্ঞানিক মহলে। তা সত্ত্বেও বস্তুবাদী ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মনে করতেন দার্শনিক কান্টের ব্যাখ্যা অনুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, এমনকি সূর্য ও গ্রহাদির সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশে ঘূর্ণায়মান বাষ্পস্তুপ বা নেবুলা থেকে। তিনি তাঁর 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকে লিখেছেন – "সৌরমন্ডলের এই যদি উৎপত্তি হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ মৃত্যুও অনিবার্য। অর্ধ শতাব্দী পরে তাঁর তত্ত্ব গাণিতিকভাবে নিষ্পন্ন করেন লাপ্লাস, (দার্শনিক কান্টের হাইপোথিসিসটি ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের, তার অর্ধ শতাব্দী পরে লাপ্লাসের গাণিতিক ধারণার জন্ম বলছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্) এবং তারও অর্ধ শতাব্দী পর বর্ণালী যন্ত্র (Spectroscope) প্রমাণ করে যে মহাশূন্যে ঘনীভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ধরনের ভাস্বর বাষ্পস্তুপ রয়েছে।" ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের সময়কালটা ছিল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ সৌর প্রজ্বালে প্রাপ্ত বিশেষ বর্ণালীর ২৭ বছর পর) পৃথিবীতে এই অজানা গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় একই প্রক্রিয়ায়। নতুন প্রাপ্ত এই গ্যাসটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় থাকায় এই মৌলটির সন্ধান এতদিন পাওয়া যায় নি। পৃথিবীতে আবিষ্কৃত নতুন এই গ্যাসটির নাম হিলিয়াম। হিলিয়ামের পৃথিবীতে আবিষ্কার কান্ট-লাপ্লাসের প্রকল্প ও গাণিতিক ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণিত করেছিল।

পৃথিবীতে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়াম আবিষ্কারের এক বছর আগেই আরেকটি নিষ্ক্রিয়গ্যাস আরগন আবিষ্কার হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কার হয়ে যায়।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে যখন রুশী বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিফ তাঁর বিখ্যাত পর্যায় সারণীটি হাজির করছেন, তখন নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির কোনোটিই আবিষ্কৃত হয় নি। সে কারণে তাঁর পর্যায় সারণীতে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি স্থান পায় নি। এছাড়া বিরল মৃত্তিকা মৌল নামে পরিচিত ১৫টি মৌলকেও এই পর্যায় সারণীতে পাওয়া যায় নি। কারণ মেন্ডেলিফের জীবিতকালেই এর বেশ কয়েকটির খোঁজ পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীদের কিছু ভুল হয়েছিল। যেমন ইংরেজ বিজ্ঞানী ডবলু ক্রুকস (যিনি থ্যালিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন বর্ণালী বিশ্লেষণ করে) তিনি ধারণা করতেন এই মৌলগুলি কোনো মৌলের বহুরূপ। তাঁর ভুল বর্ণালী বিশ্লেষণ এমন ধারণার জন্ম দিয়েছিল। এই কারণে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে বিরল মৃত্তিকার মৌলগুলি স্থান পায় নি। এছাড়া তেজস্ক্রিয় মৌলগুলিও বাদ গেছিল, কারণ পরমাণুর অবিভাজ্যতার ধারণা তখনো কায়েম ছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এমনটাই স্বাভাবিক। তবে স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম একবার আবিষ্কার হলে, (সেই আবিষ্কারের রূপ যেমনই হোক) সেই আবিষ্কার নতুন জ্ঞানের আলোয় আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতো মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে আমরা এই ঘটনাই দেখতে পাই।

মেন্ডেলিফ যোজ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিখ্যাত টেবিলটি প্রস্তুত করেন। দেখান সেখানে ক্রমান্বয়ে মৌলগুলির যোজ্যতার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যেমন হাইড্রোজেনের আছে এক যোজ্যতা, লিথিয়ামেরও এক, বেরেলিয়ামের দুই, বোরনের তিন, কার্বনের চার, নাইট্রোজেনের তিন, অক্সিজেনের দুই, ফ্লুরিনের এক, সোডিয়ামের এক, ম্যাগনেশিয়ামের দুই, অ্যালুমিনিয়ামের তিন, সিলিকনের চার, ফসফরাসের তিন,

সালফারের দুই, ক্লোরিনের এক এবং এমন আরো মৌল ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং একটা সীমার পর (চতুর্থ যোজ্যতার পর) আবার ক্রমান্বয়ে কমছে। (চিত্র-৪, মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর ১৮৭১-এর পরিমার্জিত রূপ)

মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর এক বছর পর জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী জুলিয়াস লোথার মেয়ার মৌলগুলির পারমাণবিক আয়তন (atomic volume)কে তাদের পারমাণবিক গুরুত্বের সাপেক্ষে একটি লেখচিত্র বানান। এই লেখচিত্রকে মেন্ডেলিফের আবিষ্কারের সমতুল্য ধরা চলে। তবে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী (বিশেষ করে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জিতরূপে) অনেক স্পষ্টভাবে পরিমাণের গুণে রূপান্তর এবং তার বিপরীতকে তুলে ধরলো।

নিজের পর্যায় সারণীর পর্যায় সূত্র সম্পর্কে মেন্ডেলিফ এতটাই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি বলেছিলেন ঃ **"পর্যায় সূত্র ব্যতীত আমরা না পারতাম অজানা মৌলের ধর্মগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে কিংবা না পারতাম এগুলির মধ্যে কোন কোনটির অভাব বা অনুপস্থিতি নির্ধারণ করতে।"**

এই সূত্র মেনে তিনি তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত তিনটি মৌলকে যথাক্রমে – একা–অ্যালুমিনিয়াম (Ea), একা–বোরন (Eb) এবং একা–সিলিকন (Es) ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কারণ তাঁর পর্যায় সারণীতে তৃতীয় সারণীর অ্যালুমিনিয়ামের নীচে এসেছিল অজানা মৌল একা–অ্যালুমিনিয়াম। একই নিয়মে ঐ সারণীতে যেহেতু বোরন মৌল পড়ছে তাই তিনি অজানা মৌল (একই সারণীতে অ্যালুমিনিয়ামের পর পর্যায়বৃত্ত ধর্ম মেনে) একা-বোরন (Eb)কে অনুমান করেন। একই নিয়ম অনুসারে চতুর্থ সারণীতে সিলিকনের পর টাইটেনিয়াম অতিক্রম করে একা–সিলিকনকে (Es) অনুমান করেন। তিনি তিনটি মৌলের সম্ভাব্য পারমাণবিক গুরুত্ব, ঘনত্ব, পারমাণবিক আয়তন, দ্রাব্যতা, সম্ভাব্য অক্সাইড, ফিটকারি তৈরির সম্ভাবনা ইত্যাদিও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। প্রতিটি মৌলে 'একা' শব্দটির সংযোজন করেছিলেন সংস্কৃত শব্দ এক থেকে।

পরবর্তীকালে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে অগাস্ট একা-অ্যালুমিনিয়াম অর্থাৎ গ্যালিয়াম আবিষ্কৃত হয়। আবার বিরলমৃত্তিকা মৌলগুলির ধর্মের সঙ্গে একা-বোরন (Eb) সম্ভাব্য মৌলের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মেন্ডেলিফ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে মৌলটি পর্যায় সারণীর তৃতীয় শ্রেণীতে বোরনের সদৃশ হবে। কিন্তু ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী এন. নিলসন সম্ভাব্য মৌলটি (যার নাম স্ক্যানডিয়াম দেওয়া হয়েছিল) আবিষ্কার করলেও তিনি একে চর্তুযোজী মৌল বলে মনে করেন। তিনি এর পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন নি, শুধু মোটামুটি নাম (১৬০ থেকে ১৮০) দেন। অবশেষে স্ক্যানডিয়ামকে টিন ও থোরিয়ামের মাঝখানে রাখার প্রস্তাব দেন, যেটি মেন্ডেলিফের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপন্থী ছিল। নতুন মৌলটি আবিষ্কারের পর আরেক সুইডিশ বিজ্ঞানী পি. ক্লেভে এটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তিনি আবিষ্কার করেন স্ক্যানডিয়াম ত্রিযোজী মৌল (চর্তুযোজী নয়)। তিনি উত্তেজিত অবস্থায় মেন্ডেলিফকে চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন – "যথাবিহিত সম্মানপূর্বক আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, আপনার একা-বোরন মৌলটি খুঁজে পাওয়া গেছে। সেটা হল স্ক্যানডিয়াম, যেটি এল. নিলসন এই বসন্তে আবিষ্কার করেছেন।"

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে একা-সিলিকন আবিষ্কার হয়, যার নাম হয় জার্মেনিয়াম। এর আবিষ্কর্তা উইনক্লের মেন্ডেলিফকে জানান যে তিনি একা-সিলিকন খুঁজে পেয়েছেন। এইভাবে মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে রসায়ন বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা পেল।

আগামীতে আমরা এই পর্যায় সারণীর ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করবো। (ক্রমশ)

পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে মেন্ডেলিয়েভ-এর পর্যায়-সারণি (1871) [তখন নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ অজানা ছিল।]

Series	Group I R_2O	Group II RO	Group III R_2O_3	Group IV RO_2	Group V R_2O_5	Group VI RO_3	Group VII R_2O_7	Group VIII RO_4
1	H 1							
2	Li 7	Be 9.4	B 10.82	C 12	N 14	O 16	F 19	
3	Na 23	Mg 24	Al 27. 3	Si 28	P 31	S 32	Cl 35.5	
4	K 39	Ca 40	*— 44	Ti 48	V 51	Cr 52	Mn 55	Fe 56, Co 59 Ni 59, Cu 63
5	Cu 63	Zn 65	— 68	— 72	As 75	Se 78	Br 80	
6	Rb 85	Sr 87	Y 88	Zr 90	Nb 94	Mo 96	*— 100	Ru 104, Rh 104 Pd 106 , Ag 108
7	Ag 108	Cd 112	In 113	Sn 118	Sb 122	Te 125	I 127	
8	Cs 133	Na 137	Di 138	Ce 140	*—	—	—	—
9	*—	—	—	—	—	—		— —
10	—	—	Tr 178	La 180	Ta 182	W 184	—	Os 195, Ir 197 Pt 198 , Au 199
11	Au 199	Hg 200	Tl 204	Bb 207	Bi 208	—	—	
12	—	—	—	Th 231	—	U 240	—	—

*—অনাবিষ্কৃত মৌল, — নিরুদিষ্ট মৌল, R → মৌলগুলিকে নির্দেশ করে।

চিত্র-৪

জনস্বাস্থ্য ঃ

রোগ তাড়াও, রোগ সারাও

– নিলীন

আমি নিলীন। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালো হলেও বেশি দূর পড়ার সুযোগ পাইনি। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করে তাই আইটিআইতে ভর্তি হয়ে যাই। তারপর বেশ কিছুদিন এপ্রেন্টিস থেকে বেকার শ্রমিক হয়ে ঘোরাঘুরির পর আজ একটি কারখানায় ওয়েল্ডার পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে কর্মরত।

শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই। অবশ্য আমাদের মতো শ্রমিকদের অধিকাংশ দিন শরীরের অবস্থা প্রায় একই থাকে। আমরা এই অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা হিসেবেই দেখি। কিন্তু যে অবস্থাটা স্বাভাবিক বলে আমাদের অধিকাংশের মনে হয় সেটাই কি সুস্থ অবস্থা? অসুস্থ শরীরে সেই প্রশ্নটা আজ আরও মনে দাগ কাটছে। কারখানায় যন্ত্রের আওয়াজ আমার নিত্যসঙ্গী। মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করে। তারমধ্যে আজ আবার পেটের সমস্যা। বেশ কয়েকবার গণ পায়খানায় যেতে হলো। সমগ্র কারখানা জুড়ে শ্রমিকদের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সে যাইহোক, কাজ করে তো খেতে হবে। মালিক মুনাফা দেখে, আমাদের কথা ভাববে কেন? মাস্টারকাকু শিখিয়েছিল, আমাদের শ্রমের মূল্য আত্মসাৎ করেই তো ওনার মুনাফা। ওহ, মাস্টারকাকুর কথা আপনাদের বলা হয়নি। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞান নিয়েই পড়ব, এই ইচ্ছেটা আমার জেদে পরিণত হয়েছিল। আর এই ইচ্ছেটাকে উস্কে দিয়েছিলেন যিনি, তিনি মাস্টারকাকু। উনিই প্রথম বলেছিলেন যে ভালো সাহিত্যিকও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পারেন। যেমন সুকুমার রায় বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে সাহিত্য থেকে রাজনীতি – সবই চলে বিজ্ঞানের নিয়মে। কবে, কখন, কিভাবে যে এই বিজ্ঞানমনস্ক চোখে সবকিছু দেখার দৃষ্টি তিনি আমায় দিয়েছিলেন সেটা আজও নির্ধারণ করতে পারিনি। আমাদের পাড়ার ফুটবল খেলার সঙ্গী কাম ট্রেনার ছিলেন মাস্টারকাকু। মাস্টারকাকুর মায়ের ছোট্ট সংসারটা কোনরকমে চলত কাকুর টিউশানির পয়সায়। কাকু ছোটো থেকে বড় সব বয়সের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। আর অবসর সময় শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে পড়তেন। উচ্চমাধ্যমিকের পর আর বিজ্ঞান নিয়ে পড়া না হলেও কাকু বলেছিলেন – 'পরিশ্রমের বিনিময়ে রোজগারের থেকে সম্মানের আর কিছু নেই।' আর একটা কথা বলেছিলেন, যার মানে খুব বুঝি বলে মনে হয় এমন নয়। তা হল, 'বিজ্ঞানের শিক্ষা নিতে হবে জীবনের পাঠশালা থেকে'। আমার ছাত্রজীবনের শেষে শ্রমিক হয়ে ওঠার সময়কাল থেকেই এটা অনুভব করতাম যে মানুষকে জানতে হলে তাদের কাছে যেতে হবে। শুধু বিজ্ঞান সচেতন হয়ে লাভ নেই, চারপাশের মানুষকেও সচেতন করে তুলতে হবে। আইটিআইতে ভর্তি থেকে কারখানার চাকরি সবই হয়েছে মাস্টারকাকুর পরামর্শে।

এক শ্রমিক বন্ধুর কাছ থেকে ওষুধ খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ছুটির পর বাসে উঠলাম। বাস রাস্তার বেশ কিছু অংশ জুড়ে ছোট-বড় অনেক গর্ত। বাস চলছে ধীর গতিতে। কখনও এদিকে তো কখনও ওদিকে। ঝাঁকুনিতে ঘাড় কোমর মড়মড় করে উঠছে। তার সঙ্গে ধুলোর উপদ্রব। নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

নির্দিষ্ট স্টপেজে আসতেই বাস থেকে নেমে হাঁটা লাগালাম বাড়ির দিকে। দুদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে তবু এখনও পাড়ার রাস্তায় জল থইথই। ড্রেনের নোংরা জল এসে মিশেছে বৃষ্টির জমা জলে। জল ঠেলে ঠেলে হাঁটতে কষ্ট হলেও হাঁটতে হয়। এটাই জীবন।

বাড়ির কাছাকাছি একটা বড় কমপ্লেক্স হয়েছে। সেই কমপ্লেক্সে আমাদের বস্তি ঢাকা পড়ে গেছে। কমপ্লেক্সের অনেক ফ্ল্যাটের সাথে আমাদের বস্তির বাড়িগুলোর একটা মিল আছে। সেটা হল সূর্যের আলোর অভাব। আমাদের তো প্রায় সবেরই অভাব, শুধু সূর্যের সাথে ভাব করে বাড়তি কি আর লাভ? কমপ্লেক্সের প্রধান দরজা দিয়ে একটা গাড়ি হুশ করে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জলের মধ্যে কয়েকজন অল্পবয়সী অর্ধ নগ্ন, অপুষ্ট ছেলেমেয়ে দাপাদাপি করছিল। ওদের দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। গাড়ির ধাক্কায় জলের ঢেউয়ে ভিজে সে কি আনন্দ, কি হইচই। এ যেন পাড়ার মধ্যে দুই ভারতের প্রতিচ্ছবি। প্রথম ভারতে সম্পদের প্রাচুর্য আর দ্বিতীয় ভারতে শুধুই অভাব। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যের ঠেলায় তাদের জীবন ওষ্ঠাগত। শুধু খাদ্যদ্রব্যের নয়, খরচ বাড়ছে

শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসাতেও। আর বাড়ছে, অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা, উদ্বেগ। তবু তো বাঁচতে হবে। ছোটবেলায় পড়েছিলাম, জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে ...। লিখেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। জেনেছিলাম মানুষ মরণশীল। এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে উপায় আছে দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, রোগব্যাধির কবলে পড়া মানুষকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর। বাঁচতে কে না চান? তাই হয়তো বাঁচার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু অদ্ভুত কি জানেন, সংবিধানের শতাধিক সংশোধনের পরেও আইন প্রণেতারা স্বাস্থ্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেন নি। এ এক অদ্ভুত পরিহাস। আপনারাই বলুন, স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বেঁচে থাকাটা কখনও কি সুরক্ষিত থাকতে পারে?

হাঁটতে হাঁটতে খেলার মাঠের সামনে চলে এলাম। এখানে আর জল নেই। এই মাঠে আমাদের ছোটবেলার মতো আজও ছেলেমেয়েরা খেলছে। আমাদের এই অঞ্চলে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান। আমরা বন্ধুরাও ছিলাম বিভিন্ন ধর্মের পরিবার থেকে আসা। হারুন আর জোসেফ ছিল প্রায় আমার সমবয়সী। আসগারদা ছিল আমাদের সিনিয়র, যদিও সে মাস্টার কাকুর থেকে অনেক ছোট। কিছুদিন আগে মাঠের পাশে একটা ব্যায়ামাগার তৈরি হয়েছে। গ্লোসাইন বোর্ডে বড় বড় করে লেখা "স্বাস্থ্যই সম্পদ"। অজান্তেই আমার মুখে বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল। যে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় আমরা বাস করি সেখানে স্বাস্থ্য আর আমাদের নয়, পুঁজিপতিদের সম্পদ। আমাদের স্বাস্থ্যের অধিকার পরিবর্তিত হয়েছে পুঁজিপতিদের মুনাফা অর্জনের অধিকারে।

খেলার মাঠ পেরিয়ে রেশন দোকানের সামনে আসগারদার সঙ্গে দেখা। কয়েকদিন ধরে তার ছেলে মারাত্মক পেটের ব্যথায় ভুগছিল। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসায় কোনো উন্নতি না হওয়ায় বড় হাসপাতালে রেফার করেছিল শুনেছিলাম। তারপর কি হয়েছিল জানতাম না। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'আসগারদা তোমার ছেলে এখন কেমন আছে?'

আসগারদা বলল, 'তিন চারটে হাসপাতাল ঘুরে শেষে দালাল ধরে একটা নামী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলাম। তাও বেড পাইনি। মেঝেতে জায়গা হয়েছে। দুর্ভোগের একশেষ। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সময় ডাক্তারবাবু কতগুলো পরীক্ষা আর কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন। সামান্য কয়েকটা ওষুধ হাসপাতাল থেকে পেলেও বেশ কয়েকটা বাইরে থেকে কিনতে হল। তুমি তো জানো দিন দিন ওষুধের দাম বাড়ছে। ভাত খাওয়ার পয়সা নেই, ওষুধ কিনব কিভাবে?'

আসগারদার কথাগুলো কানে খুব বাজছিল। সেদিন দৈনিক বাংলা পত্রিকায় পড়ছিলাম যে এদেশের চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগ মানুষ পুষ্টিকর খাবার পান না রোজগারের অভাবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই তথ্যের সঙ্গে আসগারদাদের অবস্থার খুব মিল। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করলাম। তাছাড়া সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করানোরও প্রয়োজন আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হারুন আর জোসেফ এসে হাজির। আমাকে দেখে ওরা খুবই উত্তেজিত। আসগারদার ছেলের অসুখ সম্পর্কে আমি জানি কিনা জানতে চাইল। আমি বললাম, 'অসুস্থ ছিল জানতাম। ডাক্তার বড় হাসপাতালে রেফার করেছিল শুনেছিলাম। এখানে এসে আসগারদার কাছে বাকিটা শুনলাম। তা তোদের খবর কি?' হারুন বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'সারা মাসের রোজগারের প্রায় অর্ধেকটা ইলেকট্রিক বিল আর গ্যাসের খরচেই চলে যায়। তোর ভাবী সেলাইয়ের কাজটা না করলে এই সংসার টানা সম্ভব ছিল না। এইতো খবরের ছিরি।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভাবলাম, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে বন্ধুবান্ধবদের সাথে আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে এই আলোচনা শুরু করা যায় ভাবতে শুরু করতেই জোসেফ বলে উঠল, চলো ওই গাছ তলায় বসে কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাক।

গাছতলায় বসে সময় নষ্ট না করে আমি ওদের বললাম – মাঠের ধারে গ্লোসাইন বোর্ডে লেখা আছে "স্বাস্থ্যই সম্পদ"। ভালো স্বাস্থ্য বলতে তোমরা কি বোঝো?

হারুন বলে উঠল, 'ভালো স্বাস্থ্য মানে সুস্থ্য শরীর।' জোসেফ হারুনের কথায় সায় দিল।

আমি আসগারদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিগো আসগারদা, তোমার কি মত?'

আসগারদা আক্ষেপ করে বলল, 'আমি যখন আমার ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম তখন ওই "স্বাস্থ্য সম্পদ" নীতিকথা কোথায় ছিল?' হারুন বলল, 'ঠিক বলেছ আসগারদা। ওসব বড়লোকের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপার তাই বড় করে ছাপে। আমাদের কথা শোনার জন্য কেউ নেই।'

চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে আমার মনে হয়েছিল যে প্রত্যেকটা মানুষ যদি তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হন তবেই

তারা সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারবে। তাই ওদের এব্যাপারে আরও সচেতন করার জন্য বললাম যে ভালো স্বাস্থ্যের জন্য সুস্থ শরীর তো অবশ্যই দরকার। হাসিখুশি মনেরও প্রয়োজন। কিন্তু সেটাই সব নয়। আমরা তখনই একজনকে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী বলব যখন তিনি দেহের এবং মনের সমন্বয় ঘটিয়ে স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশে সক্ষম হবেন। তাই ভালো স্বাস্থ্যের জন্য যেমন চাই নীরোগ শরীর, নিশ্চিন্ত মন, নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঠিক তেমনভাবেই চাই সুস্থ ও সুসংগত নির্ভরযোগ্য সমাজ।

তিনজনেই মন দিয়ে শুনে আমার কথায় সমর্থন জানালেও গ্লোসাইন বোর্ডের বক্তব্যটা নিয়ে প্রশ্ন তুলল। ওরা খুব হতাশার সুরে বলে উঠল ওই গ্লোসাইনের লেখার পাশে যে বডি বিল্ডারের ছবিটা দিয়েছে তার সাথে তোমার আমার চেহারার তফাৎটা তো দেখতেই পাচ্ছো। শোনো ভালো হাসপাতালে, ভালো ডাক্তার দেখাতে গেলে, ভালো চিকিৎসা পেতে হলে চাই টাকা। নয়তো নেতার সুপারিশ। সেখানে আমাদের মত সাধারণ মানুষ কি করবে? নীরোগ থাকতে হলে, ওই ব্যায়ামবীরের মতো না হলেও সুস্থ শরীর পেতে চাই পুষ্টিকর খাবার। ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে আমাদের ঘর আর ঘরের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। তাই আমাদের টাকা থাকলে ওসব পেতে পারতাম। গরিব হয়ে জন্মেছি। আমাদের কপাল খারাপ।

আমি বুঝলাম ওরা বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে দেখছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে একটা সামাজিক বিষয় সেটা সম্পর্কে ওদের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। আমি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ওদের মনের ভাবনা বুঝতে প্রশ্ন করলাম, কি কি হলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালোভাবে গড়ে উঠবে বলে মনে হয়?

সাধারণত খেটে খাওয়া মানুষের অসুবিধার কথা কেউ জানতে চায় না। সবাই এসে নেতাদের মত নিজের কথা একতরফা বলেই চলে যায়। সেখানে আমি ওদের মতামত জানতে চাইছি যা ওদের জীবনে সচরাচর ঘটেনি তাই আমার প্রশ্নে ওরা কিছুটা অবাক হয়ে ধীরে ধীরে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনাগুলো অগোছালোভাবে হাজির করতে লাগল। অনেক কথার মধ্যে যেগুলো উঠে এলো সেগুলো হল, ছোট হাসপাতালে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ডাক্তার নেই, নেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবন্দোবস্ত। বড় হাসপাতালে প্রচুর ভিড়, লম্বা লাইন। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও অনেক ক্ষেত্রে সুরাহা মেলে না। যেহেতু মানুষের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছে তাই হাসপাতালগুলোর আরো উন্নত করার প্রয়োজন।

আমি ওদের কথায় সমর্থন জানিয়েও বললাম, 'তোরা শুধু রোগ সারাবার জন্য যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থার কথা বলার চেষ্টা করলি। কিন্তু শুধু রোগ সারালে হবে? রোগ তাড়াতেও হবে।'

ওরা অবাক হয়ে বলল, এটা তো কোনোদিন শুনিনি। রোগ তাড়াব কিভাবে? রোগ কি চোর নাকি যে লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করব?

আমি হেসে বললাম, 'আসলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শুধু হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্স, প্যাথলজিক্যাল সেন্টার, মেডিসিন সেন্টার ইত্যাদি অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ওপর নির্ভর করে না। এর পরিধি আরো ব্যাপক। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ছাড়াও একটি ব্যক্তির জীবনযাত্রার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ বজায় রাখার জন্য যতগুলো দিক আছে সেই সব দিকগুলির স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি করতে হবে।'

ওরা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে সহজ করে বলার অনুরোধ জানাল।

মাস্টারকাকুর কথাগুলো মনে পড়ে গেল। উনি বলেছিলেন, "জীবনের পাঠশালা থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা নিতে হবে।" বুঝলাম ওদের চিন্তাভাবনা যে স্তরে রয়েছে তাতে জনস্বাস্থ্যের মতো সামাজিক বিষয় ওরা ভাবতেই পারে না। এটাও ঠিক যে আমার এই বন্ধুদের সঙ্গে আমার আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে হবে। দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে আরও আলোচনা করে ওদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে হবে।

আমি বললাম 'তাহলে শোনো, ইংরেজিতে একটা কথা আছে জানো "প্রিভেনশন ইজ দ্যা বেটার দ্যান কিওর।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বাংলা করেছিলেন "রোগ তাড়াও, রোগ সারাও।" আমাদের রোগ সারাবার থেকে রোগ তাড়ানো বেশি দরকার।'

ওরা জিজ্ঞেস করল, কিভাবে এটা সম্ভব?

আমি বললাম, 'রোগকে তাড়াতে হলে সমস্ত মানুষের মাথা গোঁজার ঠাই নিশ্চিত করতে হবে। দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগান শুধু নিশ্চিত করলে চলবে না, সুষম পুষ্টিকর খাবরের ব্যবস্থা করতে হবে। জামা-কাপড়ের অভাবে অনেককে শরীর প্রায় অনাবৃত রেখে দিন কাটাতে হয়, সেই অভাব মেটাতে হবে। প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা অর্জনের অধিকার বাস্তবায়িত

●*শেষাংশ ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

অতিথি কলাম ঃ

চোখ আমাদের মনের জানালা

– শুভময় দাশগুপ্ত

গত কয়েকটা অধ্যায়ে আমরা মানুষের চোখের গঠন আর কিছু সমস্যার কথা আলোচনা করেছি। আজ আসছি চোখের প্রধান প্রধান কয়েকটি সমস্যা আর অসুখের কথায়। হয়তো কিছু পুনরাবৃত্তি হয়ে যেতে পারে।

জানা থাকলে ক্ষতি কি?

কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা ঃ সাধারণ মানুষের ধারণা হল কম্পিউটারের মাধ্যমে সব কিছু নিখুঁত ভাবে করা যায়। তাই কম্পিউটার মাধ্যমে কিছু হলে আমরা তার ওপর খুবই নির্ভর করি। যাকে আমরা কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা বলে জানি তা আসলে একটি যন্ত্র। তার নাম অটো রিফ্রাক্টো মিটার (Autorefracto metre)। এর দ্বারা চোখের চশমার দূরের পাওয়ার নির্ধারণ করা যায়। এর সঙ্গে আর একটা লেন্স বসিয়ে নিলে তাকে বলে অটোরিফ্রাক্টো ক্যাবাটো মিটার। এর দ্বারা কর্ণিয়ার কার্ভেচার মাপা হয় – যা কন্টাক্ট লেন্স এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। চোখের আর কোন রোগ এই যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। অটোরিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা আলাদা আলাদা চোখের দূরের পাওয়ারের তিন চারটে রিডিং নেওয়া হয়। তা থেকে গড় করে একটা প্রিন্টআউট বেরিয়ে আসে। এর থেকে পাওয়ার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। শেষে চক্ষু পরীক্ষক আলাদা করে চার্ট দেখিয়ে পাওয়ার দ্বারা কাঁচ চোখে পড়িয়ে যেটাতে সবথেকে স্পষ্ট দেখা যায় সেই পাওয়ার প্রেসক্রিপশনে লেখেন। এই মেশিনে পরীক্ষা করে নিলে চোখে ড্রপ দিয়ে বড় করে রেটিনোস্কোপি পরীক্ষা করতে হয় না। একদিনেই পাওয়ার পরীক্ষা করা যায়। এর সঙ্গে কাছের পাওয়ার বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে যোগ করে দেওয়া হয়। একে বাইফোকাল চশমা বলে। তবে কোন ব্যক্তি কথা বলতে বা বোঝাতে না পারলে কিংবা ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই রিডিং দিয়েই পাওয়ার পরীক্ষা করা হয়। চোখের অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে এই যন্ত্রের কোন ভূমিকা নেই।

আমাদের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা কাজ আছে। আবার বেশিরভাগ অঙ্গেরই একাধিক কাজ থাকে। যেমন কান। শব্দ শোনা ছাড়াও শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় কানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু চোখের একটাই কাজ। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল চোখ। বেঁচে থাকার যে সুখ – তা চোখের দৃষ্টির মাধ্যমেই ধরা দেয়। পৃথিবীর রূপ চোখের মধ্য দিয়েই আমরা উপভোগ করি। কোন বস্তুর ওপর আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয় আমাদের চোখের কর্ণিয়া, লেন্স, ভিট্রিরাসের মধ্য দিয়ে পেছনের পর্দা রেটিনাতে গিয়ে পরে। সেখান থেকে অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে খবর পৌঁছালে আমরা দেখতে পাই। "চোখকে ভাল রাখতে হলে" – চোখ পরীক্ষার বা চিকিৎসার প্রথম ধাপ হল দৃষ্টি বা ভিসুয়াল অ্যাকুইটি পরীক্ষা করা।

চোখের দৃষ্টি কিভাবে পরীক্ষা করা হয়?

আমরা চক্ষু পরীক্ষা বা চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল বা চেম্বারে গেলে প্রথমেই দেওয়ালে টানানো চাট পড়তে দেওয়া হবে। ২০ ফুট বা ৬ মিটার দূরে টানানো এই চার্টের নাম স্নেলেন চার্ট। ঘরে সঠিক মাত্রায় আলো থাকা প্রয়োজন। সবার ওপরে একটি, দ্বিতীয় লাইনে দুটি – এইভাবে ক্রমশ সাইজে ছোট হতে থাকা সাতটি লাইন পড়তে হয়। নীচের সপ্তম লাইনে ক্ষুদ্রাকৃতি ছয় বা সাতটি লাইন থাকে। ওপর থেকে $\frac{6}{60}, \frac{6}{36}, \frac{6}{24}, \frac{6}{18}, \frac{6}{12}, \frac{6}{9}$ এবং সর্বশেষ $\frac{6}{6}$, এই ডিনোমিনেটর বা হর সংখ্যাটি হল চার্টের দূরত্ব আর নীচের নিউমারেটার হল এক একটি চোখে কত লাইন পড়তে পারলেন সেটা। কেউ যদি ওপর থেকে তৃতীয় লাইন পড়ে আর নীচের অক্ষরগুলি পড়তে না পারেন তবে তার দৃষ্টি হল $\frac{6}{24}$ $\frac{6}{6}$ পড়তে পারলে ধরা হবে দৃষ্টি একদম সঠিক। এবার চোখের সামনে পাওয়ার লেখা লেন্স পরিয়ে একদম নীচের লাইন অবধি পড়ানোর চেষ্টা হবে। যারা অক্ষর পরিচয় বিহীন তাদের E বা C Chart পড়ানো হয়। এর সঙ্গে বয়স্কদের সামনের দৃষ্টিও কারেকশন করতে হয়। এই নিয়ার ভিশন চার্ট সাধারণত N_6, N_7, N_8 এই দিয়ে নির্ধারণ করা হয়।

চক্ষু পরীক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র ঃ

চার্ট এবং পাওয়ার লেখা কাঁচসমৃদ্ধ ট্রায়াল বক্স ছাড়াও

প্রয়োজন হয় রেটিনোস্কোপিক মিরর। কিন্তু চোখের ভিতর পরীক্ষার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হল অপথ্যালমোস্কোপ। এই যন্ত্র দ্বারা চোখের সামনে থেকে কর্ণিয়া আর লেন্সের ভিতর দিয়ে রেটিনা পর্যন্ত দেখা যায়। রেটিনার রক্তনালী, অপটিক ডিস্ক পরিষ্কার দেখা যায়। রেটিনা বা ভিতেরর পর্দায় রয়েছে প্রায় ১৩৭ লক্ষ বিশেষ আলোক সংবেদী কোষ। তার মধ্যে ১৩০ লক্ষ রডের মত দেখতে রড (Rod Cell) কোষ, এরা সাদা কালো রঙ চেনায়। আর বাকি সাত লক্ষ রয়েছে কোন কোষ (Cone Cell)। এদের সাহায্যে আমরা রঙের তারতম্য বুঝতে পারি। কোন সেলের সমস্যার জন্য রঙ কানা রোগ হয়। কেউ কেউ কিছু কিছু রঙ বা কেউ কোন রঙই চিনতে পারেন না। এই রোগ জন্মগত। চিকিৎসায় সারে না। তাই চক্ষু পরীক্ষার সময় কালার ভিশন টেস্ট করা হয়। কারণ ড্রাইভার বা অন্যান্য অনেক পেশায় রঙ চিনতে পারা প্রয়োজনীয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি দুটি রঙ বুঝতে পারতেন না। রেটিনার আকার এক বর্গ ইঞ্চিরও কম। চোখে আলোর দৃষ্টি পরার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কোষগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তা সুক্ষাতিসুক্ষ্ম অপটিক নার্ভ তন্তুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে রাসায়নিক তরঙ্গ হয়ে পৌঁছায়। তখন আমরা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন একমাত্র মানব চক্ষুতেই কোন কোষ রয়েছে। অন্য কোনও প্রাণীর চোখে তা নেই। তাই তারা রঙ চিনতে পারে না। তাই লাল কাপড় দেখে সাপ বা মহিষের রেগে যাওয়া কথায় কোন যুক্তি নেই।

এবার চোখের কিছু অসুখ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রতিসরণের ত্রুটি ছাড়াও যে সব প্রায়ই দেখা যায়।

চোখ লাল হওয়া ঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় চোখের কর্ণিয়ার চারিপাশটা সাদা দেখায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে এই অংশ লাল হতে পারে। এই লাল হওয়া দুরকমের হয়। চোখের সরু সরু শিরা ধমনী পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায়। আর লাল খুব উজ্জ্বল দেখায়। এই লাল সাধারণত চোখের বাইরের দিকে কোন সংক্রমণ থেকে হয়। একে বলে কনজাংটাইভাল কনজেসন। কনজাংটিভাইটিস থেকে অথবা চোখে কিছু পড়লে হতে পারে। কনজাংটিভাইটিস হল লাল হওয়ার সবথেকে স্বাভাবিক কারণ। এরা চার ধরনের হয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা ফাংগাস এর অ্যালার্জিক। এই রোগে চোখে অস্বস্তি হয়, জল পরে, পিচুটি পড়ে কিন্তু দৃষ্টির ক্ষতি হয় না। অ্যালার্জিক হলে খুব চুলকোনি হতে পারে। এছাড়া আর এক রকম লাল দেখা যায়। এক্ষেত্রে শিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না। লাল রঙটা একটু হালকা গোলাপী ধরনের হয়। একে সিলিয়ারী কনজেশন বলা হয়। এটা চোখের ভিতরের অংশে কোন মারাত্মক সংক্রমণ থেকে হওয়অর সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না হলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্ধত্বও এসে যেতে পারে। রোগগুলি হল আইরিডো সাইক্লাইটিস, অ্যাঙ্গেল ক্লোসার গ্লকুমা অথবা কর্ণিয়াল আলসার বা ঘা। এছাড়া আঘাত থেকেও চোখের মধ্যে রক্ত জমে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এবার আসা যাক আর একটা মারাত্মক চক্ষুরোগ গ্লকুমার ক্ষেত্রে। গ্লকুমা পৃথিবীতে অন্ধত্বর অন্যতম কারণ। একে নীরব ঘাতক বলা হয়। কারণ প্রথম দিকে কোন উপসর্গ দেখা যায় না। গ্লকুমা এক সঙ্গে কয়েকটি চক্ষুরোগের সমষ্টি। ফুটবলের মত আমাদের চোখেও অভ্যন্তরীণ চাপ থাকে। না হলে বায়ুমন্ডলের চাপে চক্ষুগোলক চুপসে যেতো। এই চাপকে ইনট্রা আকুলার প্রেসার বা আই.ও.পি বলে। এই চাপ বেশি হলে চোখের ভিতরের নানা অংশের ক্ষতি হয়। এই চাপ বাড়তে থাকলে রেটিনার মধ্যে থাকা অপটিক নার্ভ আস্তে আস্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। দৃষ্টি ব্যাহত হয়। সোজা তাকিয়ে থাকলে চোখ, মাথা না ঘুরিয়ে আমরা ওপর, নীচে, দুই পাশে যতটা দেখতে পাই তাকে ভিসুয়াল ফিল্ড বলে। গ্লকুমার প্রথম দিকে এই ভিসুয়াল ফিল্ড কমে আসতে থাকে। শেষে দৃষ্টি কমতে কমতে অন্ধত্বে পৌঁছে যেতে পারে। তাই চোখের প্রেসার বেড়ে গেলে তাকেও ব্লাড প্রেসারের মত ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয়। গ্লকুমার ফলে হয়ে যাওয়া নার্ভের ক্ষতি আর সারিয়ে তোলা যায় না। যাতে ক্ষতি আর না বাড়ে চিকিৎসার মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করা যায়। তাই নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে প্রথমেই একে নির্ণয় ও তারপর নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এই রোগ বংশগতও হতে পারে।

এবার আসা যাক রেটিনার সমস্যায় ঃ আমাদের চোখের ভিতর তিনটে আস্তরণ আছে। স্ক্লেরা, কোরয়েড কোরসেড এবং রেটিনা। সবথেকে ভেতরের আলো সংবেদনশীল আস্তরণ হল রেটিনা। যার মধ্যে শিরা ধশনী, নার্ভ রয়েছে। চোখে ট্রপিকামাইড ড্রপ দিয়ে সাময়িকভাবে আইটিবিসকে বড় করে নিলে অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে রেটিনার বৃহৎ অংশ শিরা

উপশিরা দেখতে পাওয়া যায়। রেটিনা দশটি স্তরে গঠিত। সবথেকে বাইরের স্তরে রয়েছে পিগমেন্ট এপিথিলিয়াম। খুব পাতলা কাপড়ের মত। বাকি নয়টি আস্তরণ এক সঙ্গে থেকে সেনসরি বা সংজ্ঞাবহ রেটিনা তৈরী হয় বিশেষ বিশেষ কারণে তরল জমে বা অন্য কোন কারণে সেনসরি রেটিনা উপরে উঠে আসতে পারে। একে বলে রেটিনা ডিটাচমেন্ট। এটা বয়সের কারণে হতে পারে। এছাড়া রেটিনার ম্যাকুলা অংশে ছিদ্র বা অন্য সমস্যা হলে দৃষ্টির প্রভূত ক্ষতি হয়। ডায়াবেটিসের কারণে ম্যাকুলা খারাপ হতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ এর কারণে চোখের সমস্যা ঃ প্রবাহমান রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ধশনীর দেওয়ালে চাপ সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক রক্ত চাপ থাকরে ধমনী এই চাপ সহজেই সহ্য করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপ থাকলে বা অনিয়ন্ত্রিত রক্ত চাপের কারণে ধমনীর দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই উচ্চ রক্তচাপের কারণে হার্ট, কিডনী, মস্তিষ্কে যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি রেটিনার শিরা ধমনীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছিড়ে রক্ত জমে যেতে পারে। স্ট্রোকও হতে পারে চোখের ভিতর। হঠাৎ করে মাথা ধরা ঝাপসা লাগা শুরু হলে অবিলম্বে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

যাদের পরিবারে গ্লকুমা, রেটিনার অসুখ আছে এবং উচ্চ রক্তচাপের এবং ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের অন্তত প্রতি বছর চক্ষু বিশেষ করে রেটিনার পরীক্ষা করানো অবশ্য কর্তব্য। ■

● *জনস্বাস্থ্য ঃ*

রোগ তাড়াও, রোগ সারাও

করতে হবে। রুজিরোজগার অর্থাৎ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে, এর সাথে চাই পরিশ্রুত পানীয় জল, উন্নত পয়ঃপ্রণালী এবং যাতায়াতের সুগম ব্যবস্থা ইত্যাদি। পরিবেশ দূষণের কথাও মাথায় রাখতে হবে। তবে শুধু নদী, নালা, গাছপালা মানে প্রাকৃতিক পরিবেশ নয় আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশকেও সুস্থ থাকতে হবে। পরিবেশ দূষিত হলে তার প্রভাব থেকে আমরা কেউ রক্ষা পাব না।'

ওদের জিজ্ঞাসা, কিন্তু এসব আমরা কিভাবে ঠিক করব? আমাদের তো ...

ওদের কথা শেষ করতে না দিয়েই আস্বস্ত করে জানালাম, আমরা কেন করব? ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নয়, এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা সম্ভব কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মাধ্যমে। সেই কারণেই দাবিটা সরকারের কাছে লাগাতার করে যেতে হবে। রোগ হলে শুধু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা নয়, রোগ যাতে না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেহেতু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তাই উভয় সরকারের কাছেই আমাদের চাহিদার কথা বলতে হবে। এই আশু দাবির সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে না পারলে "স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার" কথাটা কথার কথাই থেকে যাবে।

পেটটা হঠাৎ আবার মোচড় দিয়ে উঠল। আমি বাড়ি যাওয়ার জন্য ওদের অনুমতি চাইলাম। হারুন বলল, তোমার সাথে কথা বলে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আসগারদা আর জোসেফও বলল, আচ্ছা আবার না হয় আরেকদিন কথা হবে।

ওরা চলে গেল। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও অনেক চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালাম। মনে মনে ভাবলাম, আমাদের অনেক কাজ বাকি। মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে রাজনৈতিক সংগ্রামে। কাজ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। ■

বিশেষ রচনা ঃ

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে আমাদের অনেকেরই কিছুটা ভুল ধারণা আছে। ইংরাজী ভাষায় 'ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন' শব্দবন্ধ থেকে এই ধারণার জন্ম হয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয় খাদ্য হলো সেইসব সামগ্রী যেগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজনে খাই ও তাতে পুষ্টি ও শক্তি পাই। বিজ্ঞানের পরিভাষায় বললে বলতে হয় খাদ্য (food) হল এমন আহার্য সামগ্রী যা কিনা দেহের জৈবিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান (nutrients) সরবরাহ করে। আরও যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা হল যেসব আহার্য সামগ্রী গ্রহণ করলে জীবদেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি, ক্ষয়পূরণ হয়, জৈবিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাই খাদ্য। আমরা সারাদিনে যা খাই তার কোনোটিই এই প্রয়োজনগুলির সবটা মেটায় না। এই জন্য সাধারণভাবে কাজের প্রকৃতি অনুসারে খাদ্য তিন রকম হয়। প্রধানভাবে শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য – যেমন ভাত, রুটি, ঘি ইত্যাদি। প্রধানভাবে বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সাহায্যকারী খাদ্য – যেমন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি। প্রধানভাবে রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য – যেমন শাকসবজি ও ফল ইত্যাদি।

খাদ্য ও পুষ্টিকে আলাদা করে দেখার অর্থ এমন কিছু আছে যার থেকে পুষ্টিগুণ কিছু পাওয়া যায় না এবং অন্য এমন কিছু আছে যার থেকে শুধুমাত্র পুষ্টিগুণই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধানভাবে শক্তি উৎপাদনকারী ভাত কেবলমাত্র শক্তি উৎপাদনকারী নয়, এতে পাঁচ শতাংশের মতো প্রোটিনও থাকে। রুটির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। এমনকী ঘি এর মতো পদার্থেও খুব কম মাত্রায় প্রোটিন থাকে।

খাদ্যের উপাদান বা পুষ্টি উপাদান (nutrients) প্রধানত সাতটি। শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট বা লিপিড, ভিটামিন, খনিজ উপাদান, খাদ্যের তন্তুময় অংশ বা রাফেজ এবং জল। এদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট হল অতিমাত্রিক পুষ্টি উপাদান (macronutrients)। অতিমাত্রিক পুষ্টি উপাদান বা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস আমাদের পুষ্টির জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। প্রতিটি ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে। কোন্ খাদ্যে কত ক্যালরি আছে তার দ্বারা আমরা সেই খাবারে কত শক্তি বলতে পারি। ক্যালরি হল শক্তির একক। গাড়ির ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কে থাকা কয়েক লিটার পেট্রোল জ্বালানির মতো ক্যালরির কথা চিন্তা করুন। আপনার গাড়ি যদি এক লিটার পেট্রোল ব্যবহার করে ২০ কিলোমিটার যেতে পারে এবং আপনি যদি ৪০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেন, তাহলে আপনি জানেন যে আপনার ২ লিটার পেট্রোল দরকার। খাদ্যের মধ্যে থাকা কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন এগুলো আমাদের পুষ্টিগুণ সহ দেহের জ্বালানি, ক্যালরি দেয়। খাদ্যে থাকা ভিটামিন এবং খনিজগুলি (minerals) স্বল্পমাত্রিক খাদ্য উপাদান বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। এগুলো আমাদের পুষ্টির জন্য কম পরিমাণ প্রয়োজন হয়। খাদ্য উপাদানের মধ্যে জল ও খনিজ উপাদান বাদে সবই জৈব যৌগ। জল ও খনিজ উপাদানে কার্বন থাকেনা, এরা অজৈব যৌগ।

যে খাদ্যে যে পুষ্টি উপাদান সবচেয়ে বেশি পরিমাণ থাকে তাকে সাধারণত সেই জাতীয় খাদ্য বলা হয়। যেমন মাছ, মাংস, চিংড়ি, কাঁকড়া, পনির ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। তেল, বাদাম, ঘি ইত্যাদি ফ্যাট জাতীয় খাদ্য। বিভিন্ন রকম শাকসবজি, ফল ইত্যাদি হল ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাদ্য। আবার যে খাদ্যে প্রোটিন উপাদান বেশি থাকে তাকে আমিষ খাদ্য; যে খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ শর্করার থেকে কম থাকে তাকে নিরামিষ খাদ্য বলা হয়।

এখন দেখি পুষ্টি (nutrition) কি? প্রথমেই একটি যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। যে জটিল শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে জীব খাদ্যগ্রহণ করে, সেই খাদ্যবস্তুর পরিপাক, শোষণ, আত্তীকরণ ও বহিষ্করণের মাধ্যমে (পরভোজী) অথবা সংশ্লেষ ও আত্তীকরণের মাধ্যমে (স্বভোজী) দেহের বৃদ্ধি বিকাশ ঘটায়, ক্ষয়পূরণ করে, রোগ প্রতিরোধ করে; এককথায় জীবনের মৌলিক ধর্ম গুলো পালন করে তাকে পুষ্টি বলা হয়। আমরা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকম পুষ্টি দেখা যায়। যেমন সবুজ উদ্ভিদরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাই তারা স্বভোজী বা উৎপাদক। মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণীরা খাদ্যের ব্যাপারে কোন না কোনভাবেই স্বভোজীদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। তারা পরভোজী বা খাদক, তাই তাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। আর সেইসব গৃহীত খাদ্যে থাকা পুষ্টি উপাদান বা নিউট্রিয়েন্টস তাদের জৈবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য দরকার। এখানে বলে রাখা ভালো যে পুষ্টি (nutrition) ও পুষ্টি উপাদান

(nutrients) এক কথা নয়। জীবের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন। মানুষ সহ পরভোজী সব জীব এই পুষ্টি উপাদানগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে। যেমন আমরা যে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরকারি ইতাদি যেসব খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করি। এই খাদ্যগুলোতে যেসব উপাদান থাকে তা আমাদের পুষ্টি যোগায়। যেমন ভাতের মধ্যে বেশি পরিমাণ রয়েছে কার্বোহাইড্রেট; তাছাড়া জল, সামান্য প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ উপাদান আছে।

দৈনন্দিন গৃহীত খাদ্যে প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদানের দীর্ঘদিন অভাব হলে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ধরনের অবস্থাকে অপুষ্টি (malnutrition) বলা হয়। যেমন খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে গয়টার হয়। তাছাড়া খাদ্য গ্রহণের সময় পুষ্টি উপাদানের অসমতার কারণে অপুষ্টি হতে পারে। যেমন স্থূলতা। তবে শুধু যে খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি বা আধিক্যে অপুষ্টি হয় তা নয়; খাদ্যের পরিমাণ ও তাতে গুণগত মানের অপর্যাপ্ততা বা অসাম্যতার জন্যও অপুষ্টি হয়। প্রতিটি মানুষের বয়স, ওজন, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ধরন ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিকাশ নির্ভর করে। দৈনন্দিন গৃহীত খাদ্যে পুষ্টি উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি যখন ব্যক্তি বিশেষের দেহের প্রয়োজন অনুসারে উপস্থিত থাকবে এবং সেই খাদ্য থেকে দেহে প্রয়োজনীয় শক্তির সরবরাহ বজায় থাকবে তখন একজন মানুষের পুষ্টিমান স্বাভাবিক থাকবে। দীর্ঘদিন এদের যে কোন অসাম্যের কারণে অপুষ্টি জনিত লক্ষণ দেখা যাবে। সেজন্য দেহকে সার্বিক সুস্থ রাখতে সুষম খাদ্য গ্রহণের কথা বলা হয়।

যে সব খাদ্য মানুষের প্রয়োজনীয় সার্বিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে তাদেরকে সুষম খাদ্য বলা হয়। আগেই বলেছি খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ উপাদান, রাফেজ ও জল এই খাদ্য উপাদানগুলো মানবদেহের সার্বিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য অতি জরুরী। মানবদেহের সার্বিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে প্রতিদিন এই উপাদানগুলোকে একটি সঠিক অনুপাতে খাওয়া প্রয়োজন। প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় এই পুষ্টি উপাদানগুলো সঠিক অনুপাতে উপস্থিত থাকলে তাকে সুষম খাদ্য (balanced diet) বলা হয়ে থাকে। সুস্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে, মানুষের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং প্রতিদিনের কাজ-কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিতে সক্ষম সুষম খাদ্য। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। সুষম খাদ্য আমাদের সেই প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করতে পারে। সেই সাথে সুষম খাদ্যে ভিটামিন, খনিজ উপাদান উপযুক্ত পরিমাণ থাকে। তাই দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদা পূরণের সাথে সাথে নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ-সমস্যা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারি। শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে বজায় রাখতে নিয়মিত প্রয়োজনীয পুষ্টি এবং ক্যালরির চাহিদাকে পূরণ করতে গ্রহণ করা খাবারের একটি সুষম বন্টন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে দেহের স্বাভাবিক পুষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকবে না যার ফলে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেই সাথে শরীরে নানা প্রকার রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। শৈশবে সুষম খাদ্যের ঘাটতি শিশুদের দৈহিক এবং মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবার ফলে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

আবার দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলির একটি বা একাধিক মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণও অপুষ্টি। যেমন প্রয়োজনাতিরিক্ত ফ্যাট কিংবা কার্বোহাইড্রেট, খনিজ লবণ, ওবেসিটি, হাই কোলেস্টেরল, হাই ব্লাড প্রেসার ইত্যাদির আগমণ ঘটাতে পারে। পুষ্টিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোও অপুষ্টি।

সে কারণে শরীর ও বয়স ভেদে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে গ্রহণটাই সুষম আহার গ্রহণ। তা না হলে আমরা অপুষ্টির শিকার হই।

সুষম খাদ্য গ্রহণ তথা শরীরের পুষ্টি ও শক্তি মেলার ক্ষেত্রে পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তির স্যাঁতস্যাঁতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করা আর সুস্থ পরিবেশে বসবাস পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি করে। শরীর চর্চা, খেলাধূলা না করে শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সমস্যার সমাধান নয়। সবশেষে বলা যায় যে পুষ্টির সমস্যা সরাসরি আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই শ্রমজীবী জনতাকে পুষ্টি ও স্বাস্থকর পরিবেশ নিয়ে জ্ঞান বিতরণ যথেষ্ট নয়, তাদের এই অধিকার অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে হবে। ■

স্মরণীয় ও বরণীয় ঃ

শহীদ শ্রেষ্ঠ ভগৎ সিং-এর বিজ্ঞান ভাবনা

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে মার্চ শহীদে আজম ভগৎ সিং শহীদ হন।

পৃথিবীর ও মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে ঈশ্বরবাদের বিপরীতে তিনি বিজ্ঞান মনস্ক দৃষ্টিকোণ পোষণ করতেন।

ভগৎ সিং রচিত 'কেন আমি নাস্তিক' নিবন্ধে লিখেছিলেন ঃ 'আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন কিভাবে আমি এই পৃথিবী আর মানুষের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করি। চার্লস ডারউইন এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বই পড়ুন। সোহন স্বামীর 'সাধারণ জ্ঞান'ও দেখুন। সন্তোষজনক উত্তর পাবেন। এটা জীববিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের ব্যাপার। এটা প্রাকৃতিক ঘটনা। নীহারিকার মত বিভিন্ন বস্তুর আকস্মিক সংমিশ্রণ এই পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে। কবে? এটা জানতে ইতিহাস পড়ুন। একই প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণীদের বিবর্তন ঘটেছে। আর সেটাই আরও দীর্ঘদিন চলার ফলে মানুষ এসেছে। ডারউইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' পড়ুন। পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত অগ্রগতি হয়েছে তা সবই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লাগাতার সংঘর্ষ আর প্রকৃতিকে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করার মানুষের চেষ্টার ফলে। এটাই এই ঘটনার সংক্ষিপ্ততম ব্যাখ্যা।'

ছড়ায় নামতা

– তন্ময়

চার এক্কে চার।
সাপ কামড়ালে মৃত্যু হয়
সর্বাংশে সত্য নয়
জেনে রাখা দরকার।

চার দুগুণে আট।
ভয় পেওনা অযথা
মেনে সাবধানতা
রাতে হাঁটো পথঘাট।

তিন চারে বারো।
যদি কভু কাটে সাপ
নিও না তবুও চাপ
চিকিৎসা করো।

চার চারে ষোলো।
ওঝা বা পীরের ফাঁদে
না পড়ে, এই বিপদে
হাসপাতালে চলো।

চার পাঁচে কুড়ি।
গরুর দুধ সাপের পান
কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান
কল্পনা পুরোপুরি।

চার ছয়ে চব্বিশ।
সাপ কানে শোনেনা
শব্দ তো বোঝে না
ডাকে শুধু হিসহিস।

চার সাতে আটাশ।
শক্ত বাঁধনের ফলে
রক্ত জমাট হলে
হতে পারে সর্বনাশ।

চার আটে বত্রিশ।
অনেকে অনেক সময়
অকারণে পায় যে ভয়
রজ্জু দেখে সাপ সদৃশ।

চার নয় ছত্রিশ।
সাধারণত শীতকালে
সাপ খোলস ফেলে
বিজ্ঞানের পরিভাষায় "একডাইসিস"।

চার দশে চল্লিশ।
গোখরো চন্দ্রবোড়া
কালাচ কেউটে ছাড়া
প্রায় সব সাপ নির্বিষ।

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: SO197407 of 2012-13

শিলিগুড়ি বইমেলা

আসানসোল বইমেলা

বেহালায় ব্রুনো দিবসের ছবি

পুরুলিয়া বইমেলা

বেহালায় বইমেলা

কাটাখাল ছোটোপোল এ লক্ষ্মীকান্তপুরের ছেলে মেয়েরা

সোনারপুর বইমেলা

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.com